ভারত পথিক

# রাজা রামমোহন

সনৎ মিত্র

॥ পরিবেশক ॥
ভৈরব পুস্তকালয়
১৩।১, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-বারো

প্রকাশিকা :
বীণা দেবী
যুগবাণী প্রকাশনী
১।১, রঘুনাথ চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-ছয়

শুভ ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
শ্রীফণীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী,
অবলা প্রেস,
১।এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-ছয়

# উৎসর্গ

প্রিয়

"স্বদেশ প্রেমিকদের উদ্দেশ্যে"

উনবিংশ শতাব্দীর যুগ-পথিক রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের কিছু পরিচয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে প্রকাশ করিয়া আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকার মনে কতখানি আনন্দ দিতে পারিলাম জানি না।

বিনীত :

প্রকাশীকা

## ॥ এক ॥

রাজা রামমোহন রায়।

রাজা উপাধিটি তৎকালীন দিল্লীর মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ দিয়েছিলেন। আর রায় উপাধিটিও কিন্তু কৌলিক নয়। রামমোহনের পূর্ব পুরুষের পাওয়া পদবী এই রায় রায়ান ( রায় )।

রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ছিলেন মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব কালে নবাব সরকারের কর্ম্মচারী। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের তহসিলদার ছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রকে মাঝে মাঝে কৃষ্ণনগরে খাজনা আদায় করতে আসতে হ'ত। শোনা যায় যে, একবার কৃষ্ণনগরে এক সাধু ব্যক্তির সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের আলাপ হয়। সেই সাধুর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করে তিনি উক্ত সাধুর প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন, এবং স্থানটির প্রতিও কিরূপ আকর্ষণ অনুভব করে সেখানেই বসবাসের মনস্থ করেন। পরে তিনি কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাধানগর গ্রামে বসত বাটী তৈরী করে সেখানে বাস করতে আরম্ভ করেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের বাস্তুভিটে ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার সাঁকাশা গ্রামে। কিন্তু কি ভেবে তিনি বাস্তুভিটে পরিত্যাগ করে রাধানগরে স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। নোতুন বাড়ীতে গোপীনাথের নোতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি।

এ থেকে অনুমান করা যায় যে রাধানগরের বন্দোপাধ্যায়রা বংশানুক্রমে বৈষ্ণব ছিলেন। রামকান্ত পর্যন্ত এই বৈষ্ণবানুরাগ বিদ্যমান ছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির ও ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। তাঁর

সততার জন্য নবাব তাঁর ওপর প্রবল আস্থা স্থাপন করতেন। অল্প দিনের মধ্যে যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন করেন। তাঁর কর্ম্মদক্ষতাই তাঁকে খ্যাতির উচ্চাসনে স্থাপন করেছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র— হরিপ্রসাদ, অমর চন্দ্র ও ব্রজবিনোদ। তিন পুত্রের মধ্যে ব্রজবিনোদ নিজ বিচক্ষনায় ও ধর্ম্মানুরাগের জন্য তিনিও বাংলার নবাব সিরাজ দৌল্লার অধীনে চাকরী পেয়েছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নবাবের আস্থা ভাজন হয়েছিলেন।

নবাব সরকারের অধীনে চাকরী তাঁদের বংশানুক্রমিক। তবে ব্রজবিনোদ নবাব সরকারের অধীনে বেশী দিন চাকরী করেন নি। পরে নবাব সরকার তাঁর প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন। অল্প স্থায়ী চাকরীই তার প্রকৃত কারণ। ব্যক্তিত্ব প্রবল থাকায় সামান্য অসদ্ব্যবহারে তাঁর বুক ভেঙ্গে দিয়েছিল। পরাধীনতার বেড়াজাল ভেঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর চাকরীতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ব্রজবিনোদের ছিল সাতপুত্র। তার মধ্যে পঞ্চম পুত্র ছিলেন সর্বগুনান্বিত। নাম তাঁর রামকান্ত। অত্যন্ত পিতৃভক্তি তাঁকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ করে। রামকান্ত রায়েরই কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহন।

রামকান্ত সৎসাহস ও সত্যকে চিরদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। পিতৃ অনুগত রামচন্দ্র এক অসাধারণ পিতৃসত্য পালন করেছিলেন। এটা তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় এক যুগন্তকারী ঘটনা। কতখানি সৎসাহস ও সৎপ্রকৃতি থাকলে এমন দুঃসাহসিক কাজ করা যায় তার একমাত্র প্রকৃষ্ট উদাহরণ রামকান্ত। সামাজিক অজ্ঞতা, ধর্ম্মের গোঁড়ামী তৎকালীন সমাজকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছিল। সেই ভয়ঙ্কর সমাজ ব্যবস্থার মাঝে রামকান্তের অসমসাহসিক সৎকর্ম্ম আজও ভারতের ইতিহাসে চির-অক্ষয় চির-অমর।

ব্রজবিনোদের পঞ্চমপুত্র রামকান্ত রায়ও পিতার দৃষ্টান্ত অনুসার মুর্শিদাবাদে তিনিও নবাব সরকারের চাকরী গ্রহণ করেন। পিতার ন্যায় পুত্রও অতি অল্প দিনের মধ্যে উক্ত চাকরীতে ইস্তফা দিয়াছিলেন।

চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে রামকান্ত বর্দ্ধমান রাজের নিকট থেকে খানাকুল-কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম ইজারা নিয়েছিলেন। রাধানগরের রায়েরা সেদিন থেকেই—জমিদার।

পরবর্ত্তীকালে ঐ জমিদারী তাঁদের দুর্ভাগ্যের ও সৌভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রামকান্ত তিনজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী তারিনীদেবীর গর্ভে এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রই রামমোহন। তারিনাদেবীর সঙ্গে রামকান্তের বিবাহের ব্যাপারে একটি চমকপ্রদ ঘটনা প্রচলিত আছে।

রামকান্তের পিতা ব্রজবিনোদ তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ব্রজবিনোদের এক বন্ধু শ্যাম ভট্টাচার্য্য ব্রজবিনোদকে প্রাণের অধিক ভালবাসতেন। ব্রজবিনোদও তাই।

একদিন শ্যাম ভট্টাচার্য্য বন্ধুর অন্তিম সময়ে তাঁর বহুদিনের ক্ষুধার্ত্ত বাসনার কথা ব্রজবিনোদকে জানালেন। এটা ছিল তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ। শ্যাম ভট্টাচার্য্য হঠাৎ অনুরোধ করে বসলেন। যে তাঁর কন্যার সঙ্গে ব্রজবিনোদের যে কোন ছেলের সঙ্গে যদি বিয়ে হয় তবে তিনি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

শ্যাম ভট্টাচার্য্যের অনুরোধ শুনে ব্রজবিনোদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। ভট্টাচার্য্যরা হলেন শাক্ত অর্থাৎ শক্তির উপাসক। আর রায়েরা পরম বৈষ্ণব। পূর্ব্বপুরুষ থেকে ওরা বৈষ্ণব সাধনায় মন-প্রাণ নিয়োজিত করেছেন।

শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে পর্ব্বত প্রমাণ ফারাক। দুই-এর মিলন তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় করা মোটেই সহজ ছিল না।

মহা ভাবনায় পড়লেন ব্রজবিনোদ। চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে পড়ছেন। একদিকে ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে কর্ত্তব্য-বোধ আর অন্যদিকে পরম বন্ধুর আন্তরিক অনুরোধ যেন দু·নৌকায় পা ফেলেছেন ব্রজবিনোদ।

সাত পাঁচ অনেক ভেবে তিনি স্থির করলেন যা হবার হবে তিনি বন্ধুর অনুরোধই রক্ষা করবেন।

শায়িত অবস্থাতেই তিনি সব পুত্রদেরই ডেকে পাঠালেন। পিতার ডাকে পুত্ররা এসে হাজির হয়েছে। পুত্রেরা পিতার বক্তব্য শোনার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিতাও পুত্রদের মুখের দিকে ঘোলা চোখ নিয়ে তাকালেন।

বহু আকাঙ্খিত মন নিয়ে পিতা পুত্রদের কাছে নিজের বক্তব্য— পেশ করলেন। পিতার অনুরোধ শুনে পুত্রেরা বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গেল। পিতার মুখে একি কথা! অনেকে ভাবলেন পিতার মৃত্যু সময়ে মতিভ্রম ঘটেছে।

পিতা ব্রজবিনোদ একে একে পুত্রদের কাছ থেকে মতামত জান্তে চাইলেন। সে কি মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি ব্রজবিনোদের চোখে।

প্রথম চার পুত্র সরাসরি পিতার মুখের ওপর অসম্মতি প্রকাশ করলেন এবং বললেন, "আমরা এমন অসামাজিক ও দুঃসাহসিক কাজ করতে পারব না।'

চার পুত্রের কথা শুনে পিতা অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হলেন। পুত্রেরা আরও বললেন যে এমন ধর্ম্মহীনতার কাজ করলে সমাজ তাদের কঠোর শাস্তি দেবে।

রামকান্ত পিতার মানসিক দুশ্চিন্তা উপলব্ধি করে মনে মনে তিনি নিজেও দুঃখিত ও মর্ম্মাহত। তাঁর মনেও এক কঠোর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ভাবলেন ধর্ম্মের মধ্যে উদারতাই মূখ্য বস্তু সেখানে গোঁড়ামী সমাজকে নীচেই নামিয়ে দেবে। পথ তিনিই পরিষ্কার করবেন। অনেককিছু চিন্তার পর তিনি নিজ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন।

রামকান্ত বাবাকে বললেন, "বাবা—এ বিয়েতে আমি রাজি আছি।

ব্রজবিনোদের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। রামকান্তের মুখ থেকে ঐ কথা শোনার জন্যেই বোধ হয় তিনি এতক্ষণ বেঁচেছিলেন।

পুত্র রামকান্তের কথা শুনে ব্রজবিনোদের চোখে আনন্দাশ্রু বর্ষিত

হ'ল। তিনি রামকান্তকে স্নেহ চুম্বনে আশীর্বাদ করলেন। রামকান্ত পিতা ও শ্যাম ভট্টাচার্য্যকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। রামকান্তের মস্তকে সহস্র আশীর্বাদ বর্ষিত হ'ল।

রামকান্তের সঙ্গে তারিনীদেবীর বিয়ে হ'য়ে গেল।

তারিণীদেবী শ্বশুর বাড়ী এলেন। প্রথম প্রথম বেশ কিছুদিন অসুবিধের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল তাঁকে।

এতদিন যে সংসারে মানুষ হয়েছেন তা ছেড়ে তাঁকে আসতে হয়েছে সম্পূর্ণ এক নোতুন সংসারে। এ সংসারের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ উল্টো শাক্ত থেকে একেবারে বৈষ্ণবে। এক জগৎ থেকে অন্য জগতে। সম্পূর্ণ নোতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে বেশ কষ্ট পেতে হ'ল তারিণীদেবীকে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্তাবলীকে অন্তরে মেনে নিতে তাঁকে দ্বিধায় পড়তে হয়েছে। যে ধর্ম্মকে এতদিন ধরে মনের নিভৃতে অতি যত্নে স্থান দিয়েছেন, যে ধর্ম্মের উপাসনায় তাঁর কোমল মনটি পদ্মের মত প্রস্ফুটিত হয়েছে। যে ধর্ম্মের মোহে আচ্ছন্ন ও বিভোর সেই ধর্ম্মকে ঝেড়ে মুছে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে বৈষ্ণবের আচারাদি অন্তরে গাঁথতে হবে এ নিয়ে তিনি মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন।

হঠাৎ চিন্তাস্রোত ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁর মনে পড়ে গেল যে, বিয়ের সময় তিনি গোত্রান্তরিতা হয়েছেন। তিনি আর বাপের বাড়ীর কেউ নন। আস্তে আস্তে ধর্ম্মের গোঁড়ামী তাঁর মন থেকে মুছে যেতে লাগল। মনে পবিত্রতা এল, শুচি হ'ল তাঁর মন। মনে শান্তি বিরাজ করল।

তিনি আরও উপলব্ধি করলেন যে, প্রতিটি ধর্ম্মের মূল কথা একই। পথ অনেক কিন্তু গন্তব্য স্থান একটি। সেইজন্য বৈষ্ণবের আচার-অনুষ্ঠান তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যে সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। দ্বিধা গেল কেটে। তিনি নিজেকে শ্বশুর বাড়ীতে অতি যত্নের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেন।

তাঁর উদার মনোভাব ও বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে শ্বশুর কুলের প্রত্যেকে তারিনীদেবীকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। তারিনীদেবীর বিষয় বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। সেইজন্যে গ্রামের প্রতিবেশীরা তাঁর কাছে নানা ধরণের সাংসারিক যুক্তি নিতে আসত। শোনা যায় রাম-কান্তের মৃত্যুর পর তিনি নিজে জমিদারী বিচক্ষণতার সঙ্গে দেখাশোনা করেন। তাঁর স্বামীর জীবিত অবস্থাতেও তারিনীদেবী জমিদারী চালনার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য ও পরামর্শ দিতেন।

ঐ তারিনীদেবীর গর্ভে রামমোহনের জন্ম। সেটা ছিল ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে। রাধানগরেই তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ঐ বছরই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর নবাবের কাছ থেকে বাংলা ও বিহারের দেওয়ানী লাভ করে।

## দুই।

যুগ-সারথি রামমোহন রায়ের জীবন চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন ভারতের ইতিহাসের পটভূমিকাকে জানতে হবে আগে।

ঊনবিংশ শতাব্দির ইতিহাস মূলত নবজাগরনের ইতিহাস। 'বনিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড' রূপে দেখা দিয়েছিল ভারতের মাটিতে। কি আশ্চর্য ভাগ্যের লিখন। সামান্য ব্যবসা করতে এসে ইষ্টি ইণ্ডিয়া কোম্পানী কি ভাবে ভারতের মাটিতে আস্তে আস্তে জেঁকে বসল সেটাই ভাববার কথা।

তৎকালীন পচনশীল ভারতীয় সমাজের অন্তর ভেদ করে সমাজ কাঠামোর রূপান্তর যে এসেছিল, এ কথা প্রায় সব লোকেরই জানা আছে। পলাশী যুদ্ধের পর প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ধ্যান এবং নোতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্মগ্রহণ এটা এক যুগান্তকারী ঘটনা। রেঁনেসাঁম অর্থাৎ পূর্ণজন্ম। পূর্ণ সংস্কার এসেছিল সমাজের। তৎকালীন সমাজের প্রতি শ্রেণী লোকের চিন্তা মানসে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছিল। পুরোনো সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে সকল শ্রেণীর মানুষের চিন্তাধারাও তিরোভাব ঘটেছিল। তারপরেই এসেছিল নব সংস্কৃতি।

নব সংস্কৃতি ও সংস্কারের সারথি রূপে আমরা প্রথম দেখি রামমোহনকে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কায়েম হবার পর বাংলা তথা ভারতের বুকে ধীরে ধীরে সমাজ বিপ্লব আরম্ভ হয়। এর থেকেই সৃষ্টি হয় পরিপূর্ণ নব জাগরণ। সমাজের গোষ্টীগত ও শ্রেণীগত চিন্তা ভুলে গিয়ে সেদিনের মানুষেরা বিপ্লবকেই সাদরে গ্রহণ করেছিল। এর ফলে হয়েছিল তাদের ব্যক্তি মানসের উন্মেষ। সেদিন তারা সীমাহীন-

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সীমার দেখা পেয়েছিল। ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষ সংঘটিত হওয়ার একমাত্র পথ দ্রষ্টা ছিলেন ব্রহ্মর্ষি রামমোহন।)

ভারত পথিক রামমোহন সেদিন যে আশার প্রদীপ ভারতের বুকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন পরবর্ত্তীকালে তাঁরই উত্তর সাধক রূপে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ প্রমুখ মনীষীরা সেই প্রদীপ শিখাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখে ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে তার উত্তাপ বিলিয়ে ছিলেন।)

রামমোহন যুগপুরুষ। দুর্জয় মানবিকতাবোধ, অসাধারণ আত্মশক্তি ও প্রচণ্ড আত্মবুদ্ধির সর্বপ্রথম সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি।

পলাশীর যুদ্ধের কিছুকাল পরে যখন আস্তে আস্তে ইউরোপীয় সভ্যতার স্রোত ভারতের তটভূমিতে আঘাত হান্‌তে লাগল তখন রামমোহন তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি সেদিন ইউরোপীয় সভ্যতার প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেছিলেন। কারণ অধিকাংশ ভারতবাসী ছিল অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের মনে স্বাজাত্যবোধ আনতে গেলে মানুষকে আগে শিক্ষিত হতে হবে। একমাত্র শিক্ষার তাগিদেই রামমোহন ইউরোপীয় সভ্যতাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তিনি যখন দেখলেন যে ইউরোপীয়রা ভারতবাসীকে কুশিক্ষা ও অবৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে সচেষ্ট তখন তাকে প্রতিহত করার জন্যে রামমোহনের দৃপ্তকণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

সেদিন বাহিরে থেকে যদি ইউরোপীয় আঘাত ভারতের বুকে না এসে পড়ত তবে হয়ত পরবর্ত্তীকালে পূর্ণ জাগরণ না হতেও পারত কিংবা দেরীতে হ'ত। নিজের জাতির অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করার জন্যে রামমোহন ইউরোপীয় সভ্যতাকে বরণ করেছিলেন।

সেদিন যে আঘাত ইউরোপীয় সভ্যতা দিয়েছিল তা শুধু আবর্ত্ত রচনাই করেছিল শক্তি সঞ্চার করতে পারেনি। রামমোহন দুইকালের

সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে পুরোনো জড়ত্বকে আঘাত করলেন এবং মধ্যযুগীয় পঙ্গু মনোবৃত্তির অবসান করলেন।

তিনি চিন্তা করেছিলেন, স্বদেশবাসীর অজ্ঞতাই তাদের জড় ও পঙ্গু করে দিয়েছিল। প্রথমে জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে তারা নিজেদের জীবনাদর্শ খুজে পাবে না। বিশেষ ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, একমাত্র রামমোহনই সুদীর্ঘকালের একমাত্র সমর্থগুরু, যিনি জাতীর রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের কথা চিন্তা করেছিলেন। নোতুন যুগের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার মূলক অভিসন্ধি নিয়ে তিনি যুগের সঙ্গে পদচারনা করেছিলেন।

রামমোহনের আর্বিভাব শুধু সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম্ম সংস্কারক হিসেবে নয়, তিনি এসেছিলেন মুমূর্ষু জাতির শিয়রে পিতা-মাতা রূপে। দেশ ও জাতির যথার্থ কল্যাণ কামনাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি এসেছিলেন স্নেহময়ী মাতা ও করুণাময় পিতার ব্যথিত হৃদয় নিয়ে।

জাতি যখন ব্যধিগ্রস্থ, মুমূর্ষু ও পঙ্গু, উদার হৃদয় নিক্ষেপ করে রামমোহন বুঝলেন তাদের কাতর যন্ত্রনা, এগিয়ে এলেন রোগ শয্যার পাশে।

তিনি বুঝেছিলেন যে, উপদেশ ও মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে কোন পঙ্গু জাতিকে গিরি লঙ্ঘন করান যাবে না। বাস্তববাদীর মন নিয়ে সেদিন থেকেই তিনি জাতির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সাহায্যকারী, বন্ধু ও পথপ্রদর্শক রূপে। রামমোহনকে সামনে রেখে জাতি সেদিন দুর্গম বন্ধুর পথে পাড়ি জমিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দির ঘোর তিমির ঘন অন্ধকারে একটি পূর্ণ চন্দ্রের যে উদয় ঘটবে কে তা জানত? জাতির পাষাণ মূর্ত্তিতে প্রাণ সঞ্চার করার জন্যেই যে রামমোহনের আর্বিভাব ঘটেছিল, তা কেউ কোন দিন স্বপ্নেও- কল্পনা করতে পারেনি। সঞ্জীবণী সুধার পাত্র হাতে নিয়ে জাতিকে ব্যধিমুক্ত করেছিলেন যিনি সেই মহানপুরুষ রামমোহনের জন্মলগ্নে কি কেউ শঙ্খধ্বনী করেছিল?

সারা ভারতব্যাপী নৈরাশ্য, হতাশা ও নিস্তব্ধতার মাঝে যিনি সর্ব-প্রথম শক্তির বাণী উচ্চারণ করে জাতির মনে চেতনা ও স্বাজাত্যবোধ এনেছিলেন তিনি ভারত-পথিক, যুগ-পথিক ও যুগ-সারথি রাজা রাম-মোহন রায়।

একদিকে যেমন ইউরোপীয় সভ্যতাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে-ছিলেন জাতির শিক্ষার স্বার্থে, তেমনি যখন ইউরোপীয় সভ্যতার প্লাবন এসে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্বকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল, তখন সেই মুহূর্ত্তে রামমোহনের তর্জ্জনী সংকেত সেই প্লাবনকে প্রতিহত করেছিল। তাঁর মত লোক যদি সেদিন না জন্মাতেন, হয়ত হিন্দুধর্ম্ম সেদিনের সে আঘাত সহ্য করতে না পেরে অতল সলিলে ডুবে মরত। এ-দিক দিয়ে রামমোহনকে জাতির পরিত্রাতা আখ্যায় ভূষিত করতে হবে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে একই সঙ্গে তিনি সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রয়োজন ও গুরুত্বের কথা চিন্তা করতে পেরেছিলেন এবং শুধু তাই নয়, সেগুলির যথাযথ সংস্কারও করেছিলেন। এমনি এক নিরক্ষতার যুগে ঐ সমস্ত সংস্কার মূলক মনোভাব জ্ঞাপন কত বড় কঠিন কাজ এবং তৎকালীন মানুষের মনে ঐ মন্ত্রবীজ বপন করা কত বড় দুঃসাহসিকতার পরিচয় বহন করে তা আজ আমরা চিন্তা করেও কুল কিনারা পাব না। আজকের মত উন্নতশীল সমাজেও রামমোহনের মত অসাধ্য সাধন কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ আছে।

দেশবাসী যখন গভীর ঘুমে অচেতন তখন জ্ঞানের মশাল জ্বেলে প্রহরে প্রহরে দেশবাসীর চেতনাহীন নিদ্রা ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন রামমোহন। তাঁর কণ্ঠে পৃথিবীর লোক ঐক্যের আহবান বাণী শুনতে পেয়েছিলেন, আর সেই আহ্বান ছিল রামমোহনকে আশ্রয় করে ভারতের আহ্বান।

## । তিন ॥

যেমন গাছ তেমনি তার ফল। তারিনীদেবীর গর্ভে রামমোহনের জন্ম ঠিক তেমনি।

তারিনীদেবীর ডাক নাম ছিল 'ফুল ঠাকুরাণী'। এটা অবশ্য শ্বশুর বাড়ীতেই তাঁকে ডাকৃত।

শুধু মাত্র সাংসারিক ও ধর্ম্মপরায়ণতার দিক দিয়ে তারিনীদেবীর পরিচয় ছিল না, তাঁর দেহ সৌষ্টব ছিল ফুলের মত সুন্দর।

রামমোহনও মায়ের সমস্ত গুণগুলো পেয়েছিলেন। তখন রামমোহনের আর কত বয়েস হবে—চার কি পাঁচ। তখন তাঁর পিতা রামকান্ত ছেলেকে ফার্সী ও আরবী-ভাষা শিক্ষা দেবেন মনস্থ করলেন। কারণ তাঁর ইচ্ছা পুর্বপুরুষদের মত রামমোহনও একই প্রথা অবলম্বন করবে।

তখন দেশে ইংরাজী শিক্ষার তেমন প্রচলন হয়নি। সেইজন্য সরকারী কাজ, আইন আদালতের কাজ সব কিছুই ফার্সী ও আরবী-ভাষায় হ'ত। তাহলে ছেলেকে বৈষয়িক বুদ্ধি সমপন্ন করে তুলতে গেলে ঐ ভাষা একান্তভাবে শেখা দরকার। তাছাড়া জমিদারী দেখাশোনার ব্যাপারেও একান্ত অপরিহার্য।

বাড়ীতেই বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় রামমোহনের। গ্রাম্য পাঠাশালায় পড়বার সাথে সাথে ফার্সী ভাষা শিক্ষার জন্য রামকান্ত এক মৌলবীকে গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

রামমোহনের মেধাশক্তি ছিল প্রবল। মৌলবী সাহেব তার মেধা শক্তি দেখে চমৎকৃত হলেন। ছেলে একেবারে বিছুটির চারা। মৌলবী সাহেব তাঁকে প্রথমদিন ফার্সী ভাষায় বর্ণমালা আলেক, বে, তে, টে, ইত্যাদি বলে দিলেন।

পরের দিন শিক্ষক মশায়ের কাছে রামমোহন অনগল ফার্সীর

বর্ণমালাটি মুখস্থ বলে গেলেন। মৌলবী সাহেব আরও বিস্ময় বোধ করলেন তাঁর স্মরণ শক্তির পরিচয় পেয়ে। মৌলবী সাহেব তাঁর পিতার কাছে ছেলের গুনগান করলেন।

কিছুদিন পর বালক রামমোহন ফার্সী ভাষাকে বেশ কিছুটা আয়ত্বের মধ্যে আনলেন। রামকান্ত চিন্তা করলেন। পার্সী ভাষা যখন সরকারী ভাষা তখন নবাব সরকারে মোটা মাইনের চাকরী পেতে গেলে ফার্সীকে আরও ভাল করে শেখা দরকার।

আরও উঁচুদরের আর একজন মৌলবী নিযুক্ত করলেন রামকান্ত।

বালক রামমোহনের মেধা শক্তির ও স্মরণ শক্তির বাহার দেখে মৌলবী সাহেব চোখ কপালে তুললেন। মৌলবী সাহেবেও এমন ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন এক বালককে হাতে পেয়ে নিজের মত তৈরী করলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফার্সীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ শেষকরে ফেললেন রামমোহন।

শুধু পড়াশোনা নয়, তখন সেই বাল্য অবস্থায় রামমোহনের ঠাকুরের প্রতি অসীম ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

তিনি গৃহ বিগ্রহ গোপীনাথের কাছে দিনের মাঝে কতবার মাথা নত করতেন তার ইয়ত্বা নাই। পিতা ও মাতা পুত্রের বাল্যাবস্থায় ধর্ম্মভাব লক্ষ্য করে অত্যন্ত খুসী হতেন। রামকান্ত মাঝে মাঝে এ কথাও ভাবতেন যে তিনি নিজে একদিন পিতৃসত্য পালন করে বৈষ্ণব ও শাক্তের যে মিলন ঘটিয়েছিলেন তারই পূণ্যফলের জন্যেই বোধহয় ঈশ্বর গোপীনাথ তাঁদের কোলে এমন একটি ধী-শক্তি সম্পন্ন মেধাবী ছেলেকে দিয়েছেন। এমন এক ধর্ম্ম নিষ্ঠ মেধাবী পুত্রলাভের পিছনে তাঁর পিতারও অকুণ্ঠ চিত্তের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে।

যাই হোক রামমোহন মৌলবী সাহেবের কাছ থেকে ফার্সী ভাষা শিখে বেশ কিছুটা বুৎপত্তি লাভ করলেন। ফার্সী ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গি সকলকে আশ্চর্যন্বিত করে তুলত। রামমোহনের মুখ থেকে ফার্সী ভাষা উচ্চারণের এক অক্ষর যার কানে গেছে, সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে

রামমোহনের তারিফ না করে পারেনি। কান খাড়া শুনে গেছে তাঁর পঠন ভঙ্গী।

বাড়ীতে বসে রামমোহন ফার্সী ভাষাকে এমন আয়ত্বের মধ্যে আনলেন যে মাতৃভাষাও অনেকে এত ভাল করে শিখতে পারে না।

নবাবী আমল চলে গিয়ে কোম্পানী আমল শুরু হয়েছে। তখন কার দিনে বাঙ্গালীরা কেউ স্বপ্নেও দেখত না যে কোম্পানীর সরকারের অধীনে কোন বাঙ্গালী চাকরী পেয়েছে। বড় বড় সম্ভ্রান্ত বাড়ীর কোন বাঙ্গালী পর্যন্ত এই ধরণের চিন্তা করতে পারত না।

রামকান্ত কিন্তু নবাব সরকারের অধীনে মোটা মাইনের চাকরী পাওয়ার জন্যে ফার্সী ভাষায় আরও গভীর জ্ঞানলাভ করে প্রকৃত বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন করে তোলার জন্যে ছেলেকে পাটনা পাঠাবার মনস্থ করলেন।

তখন উত্তর ভারতের মাতৃভাষা ফার্সী ভাষা। ঐ ভাষা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল পাটনা। সেখানে বড় বড় পণ্ডিত আছেন ছেলেকে ওখানে পাঠানোই শ্রেয় মনে করলেন। শেষে ঠিক করলেন ছেলেকে পাটনায় রেখে শেখাবেন। যা ভাবা তাই কাজ।

রামমোহনের তখন ন' বছর বয়েস। এত কম বয়সে ছেলেকে বিদেশে রেখে লেখাপড়া শেখাবেন এমনি কল্পনা তখনকার দিনে অবাস্তব ছিল। তখন বাড়ীর ছেলেরা কোন লেখা পড়ারই ধার ধারত না। কতখানি দুরদর্শিতা লোকের মনে থাকলে তবে এতটুকু একটা বাচ্ছা ছেলেকে দূর দেশে পাঠান সম্ভব, তা রামকান্তই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আর ছেলেও তাই, লেখাপড়া শেখার ইচ্ছা তখন রামমোহনকে ভূতের মত পেয়ে বসেছিল। পাটনা যাবার নাম শুনে তাঁর মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। রামকান্ত সাহস পেলেন আরও।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দ।

বালক রামমোহন চললেন পাটনা।

রামকান্ত ছেলের জন্যে একজন বিশিষ্ট পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিতকে

ভারত পথিক

# রাজা রামমোহন

সনৎ মিত্র

॥ পরিবেশক ॥

ভৈরব পুস্তকালয়

১৩/১, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-বারো

প্রকাশীকা :
বীণা দেবী
যুগবাণী প্রকাশনী
১।১, রঘুনাথ চাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-ছয়

শুভ ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬

মুদ্রাকর :
শ্রীফণীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী,
অবলা প্রেস,
১।এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-ছয়

# উৎসর্গ

প্রিয়

"স্বদেশ প্রেমিকদের উদ্দেশ্যে"

উনবিংশ শতাব্দীর যুগ-পথিক রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের কিছু পরিচয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে প্রকাশ করিয়া আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকার মনে কতখানি আনন্দ দিতে পারিলাম জানি না।

বিনীত :

প্রকাশিকা

## ॥ এক ॥

রাজা রামমোহন রায়।

রাজা উপাধিটি তৎকালীন দিল্লীর মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ দিয়েছিলেন। আর রায় উপাধিটিও কিন্তু কৌলিক নয়। রামমোহনের পূর্ব পুরুষের পাওয়া পদবী এই রায় রায়ান ( রায় )।

রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ছিলেন মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব কালে নবাব সরকারের কর্ম্মচারী। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের তহসিলদার ছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রকে মাঝে মাঝে কৃষ্ণনগরে খাজনা আদায় করতে আসতে হ'ত। শোনা যায় যে, একবার কৃষ্ণনগরে এক সাধু ব্যক্তির সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের আলাপ হয়। সেই সাধুর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করে তিনি উক্ত সাধুর প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন, এবং স্থানটির প্রতিও কিরূপ আকর্ষণ অনুভব করে সেখানেই বসবাসের মনস্থ করেন। পরে তিনি কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাধানগর গ্রামে বসত বাটী তৈরী করে সেখানে বাস করতে আরম্ভ করেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের বাস্তুভিটে ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার সাঁকাশা গ্রামে। কিন্তু কি ভেবে তিনি বাস্তুভিটে পরিত্যাগ করে রাধানগরে স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। নোতুন বাড়ীতে গোপীনাথের নোতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি।

এ থেকে অনুমান করা যায় যে রাধানগরের বন্দোপাধ্যায়রা বংশানুক্রমে বৈষ্ণব ছিলেন। রামকান্ত পর্যন্ত এই বৈষ্ণবানুরাগ বিদ্যমান ছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির ও ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। তাঁর

সততার জন্য নবাব তাঁর ওপর প্রবল আস্থা স্থাপন করতেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যে যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন করেন। তাঁর কর্ম্মদক্ষতাই তাঁকে খ্যাতির উচ্চাসনে স্থাপন করেছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র—হরিপ্রসাদ, অমর চন্দ্র ও ব্রজবিনোদ। তিন পুত্রের মধ্যে ব্রজবিনোদ নিজ বিচক্ষনায় ও ধর্ম্মানুরাগের জন্য তিনিও বাংলার নবাব সিরাজ দৌল্লার অধীনে চাকরী পেয়েছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নবাবের আস্থা ভাজন হয়েছিলেন।

নবাব সরকারের অধীনে চাকরী তাঁদের বংশানুক্রমিক। তবে ব্রজবিনোদ নবাব সরকারের অধীনে বেশী দিন চাকরী করেন নি। পরে নবাব সরকার তাঁর প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন। অল্প স্থায়ী চাকরীই তার প্রকৃত কারণ। ব্যক্তিত্ব প্রবল থাকায় সামান্য অসদ্ব্যবহারে তাঁর বুক ভেঙ্গে দিয়েছিল। পরাধীনতার বেড়াজাল ভেঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর চাকরীতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ব্রজবিনোদের ছিল সাতপুত্র। তার মধ্যে পঞ্চম পুত্র ছিলেন সর্বগুনান্বিত। নাম তাঁর রামকান্ত। অত্যন্ত পিতৃভক্তি তাঁকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ করে। রামকাণ্ড রায়েরই কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহন।

রামকান্ত সৎসাহস ও সত্যকে চিরদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। পিতৃ অনুগত রামচন্দ্র এক অসাধারণ পিতৃসত্য পালন করেছিলেন। এটা তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় এক যুগন্তকারী ঘটনা। কতখানি সৎসাহস ও সৎপ্রকৃতি থাকলে এমন দুঃসাহসিক কাজ করা যায় তার একমাত্র প্রকৃষ্ট উদাহরণ রামকান্ত। সামাজিক অজ্ঞতা, ধর্ম্মের গোঁড়ামী তৎকালীন সমাজকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছিল। সেই ভয়ঙ্কর সমাজ ব্যবস্থার মাঝে রামকান্তের অসমসাহসিক সৎকর্ম্ম আজও ভারতের ইতিহাসে চির-অক্ষয় চির-অমর।

ব্রজবিনোদের পঞ্চমপুত্র রামকান্ত রায়ও পিতার দৃষ্টান্ত অনুসার মুর্শিদাবাদে তিনিও নবাব সরকারের চাকরী গ্রহণ করেন। পিতার ন্যায় পুত্রও অতি অল্প দিনের মধ্যে উক্ত চাকরীতে ইস্তফা দিয়াছিলেন।

চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে রামকান্ত বর্দ্ধমান রাজের নিকট থেকে খানাকুল-কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম ইজারা নিয়েছিলেন। রাধা নগরের রায়েরা সেদিন থেকেই—জমিদার।

পরবর্ত্তীকালে ঐ জমিদারী তাঁদের দুর্ভাগ্যের ও সৌভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রামকান্ত তিনজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী তারিনীদেবীর গর্ভে এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রই রামমোহন। তারিনাদেবীর সঙ্গে রামকান্তের বিবাহের ব্যাপারে একটি চমকপ্রদ ঘটনা প্রচলিত আছে।

রামকান্তের পিতা ব্রজবিনোদ তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ব্রজবিনোদের এক বন্ধু শ্যাম ভট্টাচার্য্য ব্রজবিনোদকে প্রাণের অধিক ভালবাসতেন। ব্রজবিনোদও তাই।

একদিন শ্যাম ভট্টাচার্য্য বন্ধুর অন্তিম সময়ে তাঁর বহুদিনের ক্ষুধার্ত্ত বাসনার কথা ব্রজবিনোদকে জানালেন। এটা ছিল তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ। শ্যাম ভট্টাচার্য্য হঠাৎ অনুরোধ করে বসলেন। যে তাঁর কন্যার সঙ্গে ব্রজবিনোদের যে কোন ছেলের সঙ্গে যদি বিয়ে হয় তবে তিনি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

শ্যাম ভট্টাচার্য্যের অনুরোধ শুনে ব্রজবিনোদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। ভট্টাচার্য্যরা হলেন শাক্ত অর্থাৎ শক্তির উপাসক। আর রায়েরা পরম বৈষ্ণব। পূর্ব্বপুরুষ থেকে ওরা বৈষ্ণব সাধনায় মন-প্রাণ নিয়োজিত করেছেন।

শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে পর্ব্বত প্রমাণ ফারাক। দুই-এর মিলন তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় করা মোটেই সহজ ছিল না।

মহা ভাবনায় পড়লেন ব্রজবিনোদ। চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে পড়ছেন। একদিকে ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে কর্ত্তব্য-বোধ আর অন্যদিকে পরম বন্ধুর আন্তরিক অনুরোধ যেন দু-নৌকায় পা ফেলেছেন ব্রজবিনোদ।

সাত পাঁচ অনেক ভেবে তিনি স্থির করলেন যা হবার হবে তিনি বন্ধুর অনুরোধই রক্ষা করবেন।

শায়িত অবস্থাতেই তিনি সব পুত্রদেরই ডেকে পাঠালেন। পিতার ডাকে পুত্ররা এসে হাজির হয়েছে। পুত্রেরা পিতার বক্তব্য শোনার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিতাও পুত্রদের মুখের দিকে ঘোলা চোখ নিয়ে তাকালেন।

বহু আকাঙ্খিত মন নিয়ে পিতা পুত্রদের কাছে নিজের বক্তব্য— পেশ করলেন। পিতার অনুরোধ শুনে পুত্রেরা বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গেল। পিতার মুখে একি কথা! অনেকে ভাবলেন পিতার মৃত্যু সময়ে মতিভ্রম ঘটেছে।

পিতা ব্রজবিনোদ একে একে পুত্রদের কাছ থেকে মতামত জান্‌তে চাইলেন। সে কি মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি ব্রজবিনোদের চোখে।

প্রথম চার পুত্র সরাসরি পিতার মুখের ওপর অসম্মতি প্রকাশ করলেন এবং বললেন, "আমরা এমন অসামাজিক ও দুঃসাহসিক কাজ করতে পারব না।'

চার পুত্রের কথা শুনে পিতা অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হলেন। পুত্রেরা আরও বললেন যে এমন ধর্ম্মহীনতার কাজ করলে সমাজ তাদের কঠোর শাস্তি দেবে।

রামকান্ত পিতার মানসিক দুশ্চিন্তা উপলব্ধি করে মনে মনে তিনি নিজেও দুঃখিত ও মর্ম্মাহত। তাঁর মনেও এক কঠোর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ভাবলেন ধর্ম্মের মধ্যে উদারতাই মূখ্য বস্তু সেখানে গোঁড়ামী সমাজকে নীচেই নামিয়ে দেবে। পথ তিনিই পরিষ্কার করবেন। অনেককিছু চিন্তার পর তিনি নিজ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন।

রামকান্ত বাবাকে বললেন, "বাবা—এ বিয়েতে আমি রাজি আছি।

ব্রজবিনোদের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। রামকান্তের মুখ থেকে ঐ কথা শোনার জন্যেই বোধ হয় তিনি এতক্ষণ বেঁচেছিলেন।

পুত্র রামকান্তের কথা শুনে ব্রজবিনোদের চোখে আনন্দাশ্রু বর্ষিত

হ'ল। তিনি রামকান্তকে স্নেহ চুম্বনে আশীর্বাদ করলেন। রামকান্ত পিতা ও শ্যাম ভট্টাচার্য্যকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। রামকান্তের মস্তকে সহস্র আশীর্বাদ বর্ষিত হ'ল।

রামকান্তের সঙ্গে তারিনীদেবীর বিয়ে হ'য়ে গেল।

তারিণীদেবী শ্বশুর বাড়ী এলেন। প্রথম প্রথম বেশ কিছুদিন অসুবিধের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল তাঁকে।

এতদিন যে সংসারে মানুষ হয়েছেন তা ছেড়ে তাঁকে আসতে হয়েছে সম্পূর্ণ এক নোতুন সংসারে। এ সংসারের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ উল্টো শাক্ত থেকে একেবারে বৈষ্ণবে। এক জগৎ থেকে অন্য জগতে। সম্পূর্ণ নোতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে বেশ কষ্ট পেতে হ'ল তারিণীদেবীকে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্তাবলীকে অন্তরে মেনে নিতে তাঁকে দ্বিধায় পড়তে হয়েছে। যে ধর্ম্মকে এতদিন ধরে মনের নিভৃতে অতি যত্নে স্থান দিয়েছেন, যে ধর্ম্মের উপাসনায় তাঁর কোমল মনটি পদ্মের মত প্রস্ফুটিত হয়েছে। যে ধর্ম্মের মোহে আচ্ছন্ন ও বিভোর সেই ধর্ম্মকে ঝেড়ে মুছে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে বৈষ্ণবের আচারাদি অন্তরে গাঁথতে হবে এ নিয়ে তিনি মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন।

হঠাৎ চিন্তাস্রোত ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁর মনে পড়ে গেল যে, বিয়ের সময় তিনি গোত্রান্তরিতা হয়েছেন। তিনি আর বাপের বাড়ীর কেউ নন। আস্তে আস্তে ধর্ম্মের গোঁড়ামী তাঁর মন থেকে মুছে যেতে লাগল। মনে পবিত্রতা এল, শুচি হ'ল তাঁর মন। মনে শান্তি বিরাজ করল।

তিনি আরও উপলব্ধি করলেন যে, প্রতিটি ধর্ম্মের মূল কথা একই। পথ অনেক কিন্তু গন্তব্য স্থান একটি। সেইজন্য বৈষ্ণবের আচার-অনুষ্ঠান তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যে সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। দ্বিধা গেল কেটে। তিনি নিজেকে শ্বশুর বাড়ীতে অতি যত্নের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেন।

তাঁর উদার মনোভাব ও বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে শ্বশুর কুলের প্রত্যেকে তারিনীদেবীকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। তারিনীদেবীর বিষয় বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। সেইজন্যে গ্রামের প্রতিবেশীরা তাঁর কাছে নানা ধরণের সাংসারিক যুক্তি নিতে আসত। শোনা যায় রাম-কান্তের মৃত্যুর পর তিনি নিজে জমিদারী বিচক্ষণতার সঙ্গে দেখাশোনা করেন। তাঁর স্বামীর জীবিত অবস্থাতেও তারিনীদেবী জমিদারী চালনার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য ও পরামর্শ দিতেন।

ঐ তারিনীদেবীর গর্ভে রামমোহনের জন্ম। সেটা ছিল ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে। রাধানগরেই তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ঐ বছরই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর নবাবের কাছ থেকে বাংলা ও বিহারের দেওয়ানী লাভ করে।

## । দুই ।

যুগ-সারথি রামমোহন রায়ের জীবন চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন ভারতের ইতিহাসের পটভূমিকাকে জানতে হবে আগে।

উনবিংশ শতাব্দির ইতিহাস মূলত নবজাগরনের ইতিহাস। 'বনিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড' রূপে দেখা দিয়েছিল ভারতের মাটিতে। কি আশ্চর্য ভাগ্যের লিখন। সামান্য ব্যবসা করতে এসে ইষ্টি ইণ্ডিয়া কোম্পানী কি ভাবে ভারতের মাটিতে আস্তে আস্তে জেঁকে বসল সেটাই ভাববার কথা।

তৎকালীন পচনশীল ভারতীয় সমাজের অন্তর ভেদ করে সমাজ কাঠামোর রূপান্তর যে এসেছিল, এ কথা প্রায় সব লোকেরই জানা আছে। পলাশী যুদ্ধের পর প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ধ্যান এবং নোতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্মগ্রহণ এটা এক যুগান্তকারী ঘটনা। রেঁনেসাঁম অর্থাৎ পূর্ণজন্ম। পূর্ণ সংস্কার এসেছিল সমাজের। তৎকালীন সমাজের প্রতি শ্রেণী লোকের চিন্তা মানসে এক অদ্ভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছিল। পুরোনো সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে সকল শ্রেণীর মানুষের চিন্তাধারাও তিরোভাব ঘটেছিল। তারপরেই এসেছিল নব সংস্কৃতি।

নব সংস্কৃতি ও সংস্কারের সারথি রূপে আমরা প্রথম দেখি রাম-মোহনকে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কায়েম হবার পর বাংলা তথা ভারতের বুকে ধীরে ধীরে সমাজ বিপ্লব আরম্ভ হয়। এর থেকেই সৃষ্টি হয় পরিপূর্ণ-নব জাগরণ। সমাজের গোষ্টীগত ও শ্রেণীগত চিন্তা ভুলে গিয়ে সেদিনের মানুষেরা বিপ্লবকেই সাদরে গ্রহণ করেছিল। এর ফলে হয়েছিল তাদের ব্যক্তি মানসের উন্মেষ। সেদিন তারা সীমাহীন-

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সীমার দেখা পেয়েছিল। ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্রবোধের উন্মেষ সংঘটিত হওয়ার একমাত্র পথ দ্রষ্টা ছিলেন ব্রহ্মর্ষি রামমোহন।)

ভারত পথিক রামমোহন সেদিন যে আশার প্রদীপ ভারতের বুকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন পরবর্ত্তীকালে তাঁরই উত্তর সাধক রূপে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ প্রমুখ মনীষীরা সেই প্রদীপ শিখাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখে ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে তার উত্তাপ বিলিয়ে ছিলেন।)

রামমোহন যুগপুরুষ। দুর্জয় মানবিকতাবোধ, অসাধারণ আত্মশক্তি ও প্রচণ্ড আত্মবুদ্ধির সর্বপ্রথম সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি।

পলাশীর যুদ্ধের কিছুকাল পরে যখন আস্তে আস্তে ইউরোপীয় সভ্যতার স্রোত ভারতের তটভূমিতে আঘাত হান্‌তে লাগল তখন রামমোহন তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি সেদিন ইউরোপীয় সভ্যতার প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেছিলেন। কারণ অধিকাংশ ভারতবাসী ছিল অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের মনে স্বাজাত্যবোধ আনতে গেলে মানুষকে আগে শিক্ষিত হতে হবে। একমাত্র শিক্ষার তাগিদেই রামমোহন ইউরোপীয় সভ্যতাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তিনি যখন দেখলেন যে ইউরোপীয়রা ভারতবাসীকে কুশিক্ষা ও অবৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে সচেষ্ট তখন তাকে প্রতিহত করার জন্যে রামমোহনের দৃপ্তকণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

সেদিন বাহিরে থেকে যদি ইউরোপীয় আঘাত ভারতের বুকে না এসে পড়ত তবে হয়ত পরবর্ত্তীকালে পূর্ণ জাগরণ না হতেও পারত কিংবা দেরীতে হ'ত। নিজের জাতির অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করার জন্যে রামমোহন ইউরোপীয় সভ্যতাকে বরণ করেছিলেন।

সেদিন যে আঘাত ইউরোপীয় সভ্যতা দিয়েছিল তা শুধু আবর্ত রচনাই করেছিল শক্তি সঞ্চার করতে পারেনি। রামমোহন দুইকালের

সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে পুরোনো জড়ত্বকে আঘাত করলেন এবং মধ্যযুগীয় পঙ্গু মনোবৃত্তির অবসান করলেন।

(তিনি চিন্তা করেছিলেন, স্বদেশবাসীর অজ্ঞতাই তাদের জড় ও পঙ্গু করে দিয়েছিল। প্রথমে জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে তারা নিজেদের জীবনাদর্শ খুঁজে পাবে না। বিশেষ ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, একমাত্র রামমোহনই সুদীর্ঘকালের একমাত্র সমর্থগুরু, যিনি জাতীর রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের কথা চিন্তা করেছিলেন। নোতুন যুগের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার মূলক অভিসন্ধি নিয়ে তিনি যুগের সঙ্গে পদচারনা করেছিলেন।)

রামমোহনের আবির্ভাব শুধু সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম্ম সংস্কারক হিসেবে নয়, তিনি এসেছিলেন মুমূর্ষু জাতির শিয়রে পিতা-মাতা রূপে। দেশ ও জাতির যথার্থ কল্যাণ কামনাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি এসেছিলেন স্নেহময়ী মাতা ও করুণাময় পিতার ব্যথিত হৃদয় নিয়ে।

জাতি যখন ব্যধিগ্রস্থ, মুমূর্ষু ও পঙ্গু, উদার হৃদয় নিক্ষেপ করে রামমোহন বুঝলেন তাদের কাতর যন্ত্রনা, এগিয়ে এলেন রোগ শয্যার পাশে।

(তিনি বুঝেছিলেন যে, উপদেশ ও মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে কোন পঙ্গু জাতিকে গিরি লঙ্ঘন করান যাবে না। বাস্তববাদীর মন নিয়ে সেদিন থেকেই তিনি জাতির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সাহায্যকারী, বন্ধু ও পথপ্রদর্শক রূপে। রামমোহনকে সামনে রেখে জাতি সেদিন দুর্গম বন্ধুর পথে পাড়ি জমিয়েছিল।)

(অষ্টাদশ শতাব্দির ঘোর তিমির ঘন অন্ধকারে একটি পূর্ণ চন্দ্রের যে উদয় ঘটবে কে তা জানত? জাতির পাষাণ মূর্ত্তিতে প্রাণ সঞ্চার করার জন্যেই যে রামমোহনের আবির্ভাব ঘটেছিল, তা কেউ কোন দিন স্বপ্নেও- কল্পনা করতে পারেনি। সঞ্জীবণী সুধার পাত্র হাতে নিয়ে জাতিকে ব্যধিমুক্ত করেছিলেন যিনি সেই মহানপুরুষ রামমোহনের জন্মলগ্নে কি কেউ শঙ্খধ্বনী করেছিল?)

সারা ভারতব্যাপী নৈরাশ্য, হতাশা ও নিস্তব্ধতার মাঝে যিনি সর্ব-প্রথম শক্তির বাণী উচ্চারণ করে জাতির মনে চেতনা ও স্বাজাত্যবোধ এনেছিলেন তিনি ভারত-পথিক, যুগ-পথিক ও যুগ-সারথি রাজা রাম-মোহন রায়।

একদিকে যেমন ইউরোপীয় সভ্যতাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে-ছিলেন জাতির শিক্ষার স্বার্থে, তেমনি যখন ইউরোপীয় সভ্যতার প্লাবন এসে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্বকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল, তখন সেই মুহূর্ত্তে রামমোহনের তর্জ্জনী সংকেত সেই প্লাবনকে প্রতিহত করেছিল। তাঁর মত লোক যদি সেদিন না জন্মাতেন, হয়ত হিন্দুধর্ম্ম সেদিনের সে আঘাত সহ্য করতে না পেরে অতল সলিলে ডুবে মরত। এ-দিক দিয়ে রামমোহনকে জাতির পরিত্রাতা আখ্যায় ভূষিত করতে হবে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে একই সঙ্গে তিনি সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রয়োজন ও গুরুত্বের কথা চিন্তা করতে পেরেছিলেন এবং শুধু তাই নয়, সেগুলির যথাযথ সংস্কারও করেছিলেন। এমনি এক নিরক্ষতার যুগে ঐ সমস্ত সংস্কার মূলক মনোভাব জ্ঞাপন কত বড় কঠিন কাজ এবং তৎকালীন মানুষের মনে ঐ মন্ত্রবীজ বপন করা কত বড় দুঃসাহসিকতার পরিচয় বহন করে তা আজ আমরা চিন্তা করেও কুল কিনারা পাব না। আজকের মত উন্নতশীল সমাজেও রামমোহনের মত অসাধ্য সাধন কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ আছে।

দেশবাসী যখন গভীর ঘুমে অচেতন তখন জ্ঞানের মশাল জ্বেলে প্রহরে প্রহরে দেশবাসীর চেতনাহীন নিদ্রা ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন রামমোহন। তাঁর কণ্ঠে পৃথিবীর লোক ঐক্যের আহবান বাণী শুনতে পেয়েছিলেন, আর সেই আহ্বান ছিল রামমোহনকে আশ্রয় করে ভারতের আহ্বান।

## ॥ তিন ॥

যেমন গাছ তেমনি তার ফল। তারিনীদেবীর গর্ভে রামমোহনের জন্ম ঠিক তেমনি।

তারিনীদেবীর ডাক নাম ছিল 'ফুল ঠাকুরাণী'। এটা অবশ্য শ্বশুর বাড়ীতেই তাঁকে ডাকৃত।

শুধু মাত্র সাংসারিক ও ধর্ম্মপরায়ণতার দিক দিয়ে তারিনীদেবীর পরিচয় ছিল না, তাঁর দেহ সৌষ্টব ছিল ফুলের মত সুন্দর।

রামমোহনও মায়ের সমস্ত গুণগুলো পেয়েছিলেন। তখন রামমোহনের আর কত বয়েস হবে—চার কি পাঁচ। তখন তাঁর পিতা রামকান্ত ছেলেকে ফার্সী ও আরবী-ভাষা শিক্ষা দেবেন মনস্থ করলেন। কারণ তাঁর ইচ্ছা পূর্বপুরুষদের মত রামমোহনও একই প্রথা অবলম্বন করবে।

তখন দেশে ইংরাজী শিক্ষার তেমন প্রচলন হয়নি। সেইজন্য সরকারী কাজ, আইন আদালতের কাজ সব কিছুই ফার্সী ও আরবী-ভাষায় হ'ত। তাহলে ছেলেকে বৈষয়িক বুদ্ধি সমপন্ন করে তুলতে গেলে ঐ ভাষা একান্তভাবে শেখা দরকার। তাছাড়া জমিদারী দেখাশোনার ব্যাপারেও একান্ত অপরিহার্য।

বাড়ীতেই বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় রামমোহনের। গ্রাম্য পাঠাশালায় পড়বার সাথে সাথে ফার্সী ভাষা শিক্ষার জন্য রামকান্ত এক মৌলবীকে গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

রামমোহনের মেধাশক্তি ছিল প্রবল। মৌলবী সাহেব তার মেধা শক্তি দেখে চমৎকৃত হলেন। ছেলে একেবারে বিচ্ছুটির চারা। মৌলবী সাহেব তাঁকে প্রথমদিন ফার্সী ভাষায় বর্ণমালা আলেক, বে, তে, টে, ইত্যাদি বলে দিলেন।

পরের দিন শিক্ষক মশায়ের কাছে রামমোহন অনগল ফার্সীর

বর্ণমালাটি মুখস্থ বলে গেলেন। মৌলবী সাহেব আরও বিস্ময় বোধ করলেন তাঁর স্মরণ শক্তির পরিচয় পেয়ে। মৌলবী সাহেব তাঁর পিতার কাছে ছেলের গুনগান করলেন।

কিছুদিন পর বালক রামমোহন ফার্সী ভাষাকে বেশ কিছুটা আয়ত্বের মধ্যে আনলেন। রামকান্ত চিন্তা করলেন। পার্সী ভাষা যখন সরকারী ভাষা তখন নবাব সরকারে মোটা মাইনের চাকরী পেতে গেলে ফার্সীকে আরও ভাল করে শেখা দরকার।

আরও উঁচুদরের আর একজন মৌলবী নিযুক্ত করলেন রামকান্ত।

বালক রামমোহনের মেধা শক্তির ও স্মরণ শক্তির বাহার দেখে মৌলবী সাহেব চোখ কপালে তুললেন। মৌলবী সাহেবেও এমন ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন এক বালককে হাতে পেয়ে নিজের মত তৈরী করলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফার্সীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ শেষকরে ফেললেন রামমোহন।

শুধু পড়াশোনা নয়, তখন সেই বাল্য অবস্থায় রামমোহনের ঠাকুরের প্রতি অসীম ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

তিনি গৃহ বিগ্রহ গোপীনাথের কাছে দিনের মাঝে কতবার মাথা নত করতেন তার ইয়ত্বা নাই। পিতা ও মাতা পুত্রের বাল্যাবস্থায় ধর্ম্মভাব লক্ষ্য করে অত্যন্ত খুসী হতেন। রামকান্ত মাঝে মাঝে এ কথাও ভাবতেন যে তিনি নিজে একদিন পিতৃসত্য পালন করে বৈষ্ণব ও শাক্তের যে মিলন ঘটিয়েছিলেন তারই পূণ্যফলের জন্যেই বোধহয় ঈশ্বর গোপীনাথ তাঁদের কোলে এমন একটি ধী-শক্তি সম্পন্ন মেধাবী ছেলেকে দিয়েছেন। এমন এক ধর্ম্ম নিষ্ঠ মেধাবী পুত্রলাভের পিছনে তাঁর পিতারও অকুণ্ঠ চিত্তের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে।

যাই হোক রামমোহন মৌলবী সাহেবের কাছ থেকে ফার্সী ভাষা শিখে বেশ কিছুটা বুৎপত্তি লাভ করলেন। ফার্সী ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গি সকলকে আশ্চর্যন্বিত করে তুলত। রামমোহনের মুখ থেকে ফার্সী ভাষা উচ্চারণের এক অক্ষর যার কানে গেছে, সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে

রামমোহনের তারিফ না করে পারেনি। কান খাড়া শুনে গেছে তাঁর পঠন ভঙ্গী।

বাড়ীতে বসে রামমোহন ফার্সী ভাষাকে এমন আয়ত্বের মধ্যে আনলেন যে মাতৃভাষাও অনেকে এত ভাল করে শিখতে পারে না।

নবাবী আমল চলে গিয়ে কোম্পানী আমল শুরু হয়েছে। তখন কার দিনে বাঙ্গালীরা কেউ স্বপ্নেও দেখত না যে কোম্পানীর সরকারের অধীনে কোন বাঙ্গালী চাকরী পেয়েছে। বড় বড় সম্ভ্রান্ত বাড়ীর কোন বাঙ্গালী পর্যন্ত এই ধরণের চিন্তা করতে পারত না।

রামকান্ত কিন্তু নবাব সরকারের অধীনে মোটা মাইনের চাকরী পাওয়ার জন্যে ফার্সী ভাষায় আরও গভীর জ্ঞানলাভ করে প্রকৃত বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন করে তোলার জন্যে ছেলেকে পাটনা পাঠাবার মনস্থ করলেন।

তখন উত্তর ভারতের মাতৃভাষা ফার্সী ভাষা। ঐ ভাষা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল পাটনা। সেখানে বড় বড় পণ্ডিত আছেন ছেলেকে ওখানে পাঠানোই শ্রেয় মনে করলেন। শেষে ঠিক করলেন ছেলেকে পাটনায় রেখে শেখাবেন। যা ভাবা তাই কাজ।

রামমোহনের তখন ন' বছর বয়েস। এত কম বয়সে ছেলেকে বিদেশে রেখে লেখাপড়া শেখাবেন এমনি কল্পনা তখনকার দিনে অবাস্তব ছিল। তখন বাড়ীর ছেলেরা কোন লেখা পড়ারই ধার ধারত না। কতখানি দুরদর্শিতা লোকের মনে থাকলে তবে এতটুকু একটা বাচ্ছা ছেলেকে দূর দেশে পাঠান সম্ভব, তা রামকান্তই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আর ছেলেও তাই, লেখাপড়া শেখার ইচ্ছা তখন রামমোহনকে ভূতের মত পেয়ে বসেছিল। পাটনা যাবার নাম শুনে তাঁর মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। রামকান্ত সাহস পেলেন আরও।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দ।

বালক রামমোহন চললেন পাটনা।

রামকান্ত ছেলের জন্যে একজন বিশিষ্ট পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিতকে

খুঁজলেন। পেলেন তিনি। ছেলেকে মৌলবীর হাতে সমর্পণ করে তিনি বাড়ী ফিরলেন। সেখানেও রামমোহনের মেধাশক্তির পরিচয় পেয়ে মৌলবী বিস্ময়াভূত হলেন।

পার্শী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরবীও শিখতে লাগলেন। কিছু দিনের মধ্যে ছু'টি ভাষাকে সুন্দরভাবে বপ্ত করলেন। একেবারে মাতৃভাষার মত ছু'টি ভাষাকে আয়ত্ব করে তাঁর বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর ও মার্জিত করলেন।

তিনি সেখানে মাত্র তিন বছর ছিলেন। এই সামান্য দিনেব অবস্থান রামমোহনের জীবনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। মূল আরবীতে এ্যারিষ্টটল ও ইউক্লিডের গ্রন্থ পাঠ তার স্বাভাবিক বুদ্ধিব রূপান্তর ঘটে। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করে ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি তাব মন সদাব্যগ্র থাকত। পরবর্ত্তী কালে আমবা যে রামমোহনকে মহান তার্কিক রূপে দেখি এখানেই সেই জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল।

পাটনায় অবস্থান কালে রামমোহন মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরান পাঠ কবলেন। কোরান পাঠ কবে তিনি বুঝলেন ঈশ্বর এক এব নিরাকার।

পরবর্ত্তীকালে হিন্দুদের বহু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর মন ক্ষেপে গিয়েছিল। তখনকার দিনের প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁর মন থেকে মুছে গেল। তিনি বুঝলেন দেবতা এক, আর সমাজ যে সমস্ত উপদেবতাদের সৃষ্টি করেছে সেগুলো সব ভাঁওতা বাজী ছাড়া আর কিছু নয়।

কোরানে তিনি আরও পড়লেন যে, নারীজাতির প্রতি সুবিচার ও সদ্ব্যবহাবের কথা। তৎকালীন সমাজে এক শ্রেণীর গোঁড়া ধার্ম্মিক নিজেদেব সুবিধে মত আইন প্রচলন করে নারীজাতির স্বাভাবিক চলাফেরাকেও আইনের বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। কোরান পড়ে সেদিন রামমোহনের চমক ভাঙ্গল। সেদিন থেকেই শৃঙ্খলিতা নারীজাতিকে মুক্তি দেবার বাসনা আস্তে আস্তে দানা বেঁধে উঠল। পরবর্ত্তী কালে নারীজাতির কল্যাণে তিনি জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

কোরান পাঠ করে রামমোহন সব চেয়ে বড় সত্যকে সেদিন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তা হ'ল—"জীবের সেবা ভিন্ন ধর্ম্ম আর নাই।" পাটনায় আরবী ও ফার্সী পড়া শেষ হ'ল রামমোহনের।

লোক পরম্পরায় রামকান্ত যখন শুন্‌লেন যে, ছেলে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁর ভাবনার আর সীমা রইল না। হিন্দু ঘরের ছেলে বিধর্ম্মী হ'য়ে যাচ্ছে এ সংবাদ শুনে রামকান্তের মন অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে পড়ল। শ্যাম ভট্টাচার্য্যের অভিশাপের কথা মনে পড়ল। শ্যাম ভট্টাচার্য্য রামমোহনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। তারিনীদেবীকে রাগান্বিত হ'যেই বলেছিলেন, 'তোর ছেলে বিধর্ম্মী হবে।"

শোনা যায় মামার বাড়ীতে থাকাকালীন একবার শ্যাম ভট্টাচার্য্য প্রসাদী বেলপাতা দিয়েছিলেন। রামমোহন মাথায় ঠেকানোর পরিবর্ত্তে বেলপাতাটিকে মুখে পুরে চিবুতে আরম্ভ করেছিলেন। সেদিনই তাঁর দাদু তাঁকে উদ্দেশ্য করে মেয়ে তারিনীদেবীকে বলেছিলেন 'তোর ছেলে বিধর্ম্মী হবে।'

তারিনীদেবী ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে পড়লেন পিতার কথা শুনে। মেয়ের মনের অবস্থা উপলব্ধি কবে তিনি নিজেই লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন। তখন রামমোহনেব মাত্র চার বছর বয়েস। এত কম বয়সের শিশুকে অভিশাপ দেওয়া সত্যিই যুক্তিযুক্ত নয়।

তিনি একান্ত লজ্জিত চিত্তে মেয়ের কাছে এগিয়ে এসে বললেন—'তবুও তোর ছেলে মস্ত বড় লোক হবে।'

রামমোহনের কাণ্ড কারখানা দেখে তাব মনের পরিবর্ত্তনের জন্যে রামকান্ত তাঁকে কাশী পাঠালেন। তখন রামমোহনের বয়েস বার বছর।

কাশী গিয়ে সংস্কৃত পাঠে মনোনিবেশ করলেন। আগেই বলেছি তাঁর তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি মেধা শক্তি ছিল প্রবল। অসাধারণ স্মরণ শক্তির বলে তিনি সংস্কৃতে বচিত হিন্দুদেব ধর্ম্মগ্রন্থগুলির গভীরতম রহস্যগুলোকে মনের মধ্যে গেঁথে নিলেন।

বেদান্ত পড়ে তিনি একমাত্র ব্রহ্মের সন্ধান পেলেন। মুসলমানদের

কোরানের মূল কথার সঙ্গে বেদান্তের মূল কথায় কোন গরমিল নাই। তিনি বেদান্ত পাঠ করে জানলেন একমাত্র ব্রহ্মই অনাদি, ব্রহ্মই অনন্ত। একমাত্র ব্রহ্মের উপাসনা করেই জীবের মুক্তি আসবে।

কোরান পড়ে হিন্দুদের উপদেবতা ও তৎকালীন পণ্ডিত সমাজের দুর্নীতি, কুপ্রথা সম্বন্ধে যে ধারনা তিনি পোষণ করে আসছিলেন, তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে 'বেদান্ত' পড়ে।

বহু পৌত্তলিকের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করলেন।

তিনি কাশীতে নিজের মতবাদ প্রচার করলেন। নিজের মতবাদকে এবং হিন্দু শাস্ত্রের মুল কথাও লোকে উপযুক্ত যুক্তি দিয়ে খাড়া করলেন, তখন কাশীতে হৈ হৈ রব পড়ে গেল।

এতদিনের প্রচলিত ধর্ম্মভাবের মুলে আঘাত পড়তেই বড় বড় পণ্ডিতদের টনক নড়ল।

এত বড় মিথ্যাচারকে প্রশয় দেওয়া সমীচান নয় এই ভাবনার উদ্রেক হ'ল কাশীর পণ্ডিত সমাজে। অনেক পণ্ডিত এল বালক রামমোহনের কাছে। রামমোহনের ধারনাকে পাল্টে দেবার অভিপ্রায়ে কত পণ্ডিত রাগান্বিত হ'য়ে এল রামমোহনের কাছে। কিন্তু রামমোহনের অকাট্য যুক্তির কাছে প্রত্যেকটি পণ্ডিত লজ্জিত হ'য়ে ফিরে গেলেন।

শোনা যায় রামমোহনকে তার বিরোধী পক্ষেরা কাশীথেকে তাড়িয়ে দেবার মনস্থ করেছিলেন।

রামমোহন কাশীতে বহু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে শুদ্ধ ধর্ম্মীয় মতবাদ সম্বলিত একখানি পুস্তক রচনা করেন। বইটির নাম 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালা ; এটি যখন লেখা হয়েছিল তখন তাঁর বয়েস মাত্র ষোল বছর।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ।

তখন বাংলা ভাষা ছাপার অক্ষরে দেখা দেয় নাই। যদি মুদ্রণের কোন ব্যবস্থা তখন থাকত, তাহলে তা হিন্দু সমাজে বিলি করে সমাজে একটা ছোটখাট ভুমিকম্প সৃষ্টি করা যেত।

বই লেখার খবর চাপা রইল না। শীঘ্রই জনাজানি হ'য়ে গেল।

কাশীতে পণ্ডিতদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। বাড়ীতেও খবর পৌঁছতে বেশী দেরী হ'ল না। হিন্দু হ'য়ে একি কাণ্ড! মাত্র ষোল বছরেব ছেলের মাথায় কে এমন দুরবুদ্ধি যোগাল?

কাশীর জনগণ ষোল বছরের ছেলের শাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্য দেখে ধন্য ধন্য করলেন। কিন্তু রামমোহন সমস্ত পণ্ডিতকুলের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। এবার রামমোহন বাড়ী ফেরার মনস্থ করলেন। ভাবলেন দেশে ফিরে গিয়ে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বগুলো সর্ব সমক্ষে তুলে ধরবেন। দেশবাসীর কালনিদ্রাকে ভাঙ্গিয়ে সমাজকে এক চবম সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠা করবেন।

তিনি কাশী পরিত্যাগ করলেন স্বেচ্ছায়।

এদিকে পিতা রামকান্ত ভাবছেন যে, এত আশা এত অর্থব্যয় সমস্তই বিফলে গেল। শেষে কিনা ছেলে বিধর্ম্মী হ'য়ে গেল?

রামমোহনেব বাড়ী ফেরার সংবাদ পেয়ে ঐ অঞ্চলের গোঁড়া পণ্ডিতেরা রামকান্তেব সঙ্গে দেখা করলেন। রামমোহনকে এই পথ থেকে ফেরাবার জন্যে বামকান্তকে অনুরোধ জানালেন। কেউ কেউ আবার তাঁকে বক্র চক্ষু দেখালেন। অবিষ্যতে এর ফলাফল যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে একথাটাও জানিয়ে যেতে তারা ভুলল না।

যখন রামমোহন বাড়ী ফিরলেন তখন মা তারিনীদেবী ছিলেন অন্দর মহলে। অন্দর মহল থেকে তিনি ছুটে বেরিয়ে আসতেই রামমোহন মাকে প্রণাম করার জন্যে এগিয়ে যেতেই মা বললেন,—"আমার গৃহে বিধর্ম্মীর স্থান নাই"। ছেলের প্রণাম গ্রহণ করলেন না তিনি।

সেদিন মাযের কাছ থেকে যে অন্ধ সংস্কারের আঘাত তিনি পেয়েছিলেন, তার ফলে তাঁকে আরও বিদ্রোহী করে তুলেছিল ভবিষ্যতে। তারপর থেকে তাঁর কুসংস্কার বিতাড়নের ঝোঁক শতগুণে বেড়ে গেল।

## ॥ চার ॥

তারপর কিছুদিন মাত্র তিনি বাড়ীতে ছিলেন।

অল্পদিন অবস্থান কালে তিনি গ্রামের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে বেড়াতেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের মূল সত্যকে দেশবাসীদের সামনে তুলে ধরবার জন্যে গ্রামেব বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় পরিজনদের কাছে নিজের ধর্ম্ম প্রচার করলেন। কিন্তু ক কার কথা শোনে। উল্টে তাঁকেই অনেক কড়া কথা শুনতে হ'ল।

একবার বেড়াতে বেড়াতে এসে গ্রামের শেষে উপনীত হয়েছেন। তিনি দেখলেন একটা জায়গায় অনেক লোক একত্রে জড় হয়ে কি সব করছে। মাঝে মাঝে 'বল হরি, হরি বোল' উচ্চারণ ধ্বনী উচ্চারিত হচ্ছে সমবেত কণ্ঠে। ব্যাপারটা তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করলেন। শেষে তিনি দেখলেন একজন নারীকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে সহমরণে দেবাব উদগ্র বাসনা নিয়ে লোকগুলো পৈশচিক তৃপ্তি ভোগ করছে।

নারীর সুন্দর সুকোমল দেহখানিকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে জোর কবে স্বামী চিতায় তুলে দেওয়া হ'ল। দাউ দাউ করে আগুনের লেলিহান শিখায় রামমোহনের চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

মুর্চ্ছাপ্রায় রামমোহন টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী ফিরলেন। অন্তরের শোক নিবাবণ করার জন্যে তিনি পড়ার ঘরে ঢুকে পড়লেন। তাঁকে দেখতে হবে, কোন্ হিন্দুশাস্ত্রে এমন জঘন্ন ও নৃশংস কাজের কথা লেখা আছে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বইয়ের মধ্যে ডুবে থাক্‌তে দেখে মা ও বাবা ঢুকলেন তাঁর পড়ার ঘরে। বাবা ও মা কত বোঝালেন ছেলেকে। ছেলে শুধু বিরক্তই হ'তে লাগলেন মা-বাবাব অন্ধ উপদেশ শুনে।

ছেলে তার বাবাকে বললেন,—"তোমাদের অশাস্ত্রীয় কোন কিছুই আমি মেনে নিতে পারব না।"

পিতা বললেন,—"সমাজের প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাসের কোনটাই মিথ্যে নয় বাবা।"

ছেলে উত্তর দিলেন—'সবগুলোই মিথ্যে।"

"না কিছুতেই না।' পিতার স্বর আর একটু গম্ভীর হ'ল।

রামমোহন বললেন,—"তোমাদের কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে বহু পুতুলের পূজার কথা? কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার কথা? এতে স্ত্রী কোনদিনই সতী হয় না। এটা তার অনিচ্ছায বাধ্য হ'য়ে মৃত্যু ববণ করা।"

পিতা কোন উত্তর দিতে পাবলেন না। শুধু বললেন,—'খোকা, তোমাব সবে বাড়াবাড়ি।

—"বাড়াবাড়ি না বাবা। আমি যা বলছি সবই শাস্ত্রোচিত। আপনাবা যা বলেন তা শাস্ত্র বহির্ভূত। কিভাবে কতগুলো স্বার্থন্বেসী লোক উদাব ব্রহ্মবাদী হিন্দুধর্ম্মকে বিনষ্ট করার জন্যে নানা রকমের অসদাচারণ, কু-প্রথা ও অকারণ অনুষ্ঠান করে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের সত্যকে নষ্ট কবার প্রয়াসী হয়েছে; তা কি আপনাদের চোখে পড়ে না?"

রামমোহনের অকাট্য যুক্তিকে খণ্ডন করতে না পেরে পিতা বললেন,—"তোমার সঙ্গে কূট তর্ক আমি করতে চাই না। তোমার মত পুত্রের জন্ম দিয়ে আজ নিজেকে পাপী বলে মনে হচ্ছে। তুমি এখন যেতে পার।"

রামমোহন পিতার কথায় বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সেদিনের দৃশ্য দেখার পর থেকে তার বিদ্রোহী মন সব সময় সত্যকারের শাস্ত্র-বাণী শোনার জন্যে উণ্মুখ হ'য়ে উঠল।

কি ভয়ঙ্কর হিন্দু সমাজের রূপ। শাস্ত্রের নামে এত ভণ্ডামী কিছুতেই সহ্য করবেন না। আরও শিখতে হবে, জানতে হবে পরম ব্রহ্মকে। এমন পঙ্কিলতার মাঝে থাকতে তার মন চাইল না।

ভাবতে ভবেতে একদিন বেরিয়ে পড়লেন রামমোহন বাড়ী ছেড়ে।

॥ পাঁচ ॥

মাত্র ষোল বছর বয়েসে রামমোহন বেরিয়ে পড়লেন ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। তিনি যে দৃঢ়তা ও যে আত্মপ্রত্যয়ে স্থির ছিলেন, তা স্নেহ-ভালবাসা ও হৃদয়াবেগের উর্দ্ধে কর্ত্তব্য বোধের প্রেরণায় অবিচলিত ছিল। সেইজন্যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমন কি পিতা মাতা পর্যন্ত তাঁকে ভুল বুঝেছেন। তাই জনগণের ভুল, পিতা মাতার ভুল কি সংশোধন করা যায় কি করে তাদের মনের অন্ধকাব দূরীভূত করা যায় সেই সংকল্প নিয়ে ভারত-পথিক রামমোহন খুঁজতে বেরুলেন চরম সত্যকে যে সত্য কোনদিন কারও কাছে হাব মানবে না নতি স্বীকার করবে না।

ভারতের নগরে, প্রান্তরে, মরুতে ও পর্বতে ঘুরবেন তিনি। ভারত মাতার প্রতি ধূলিকনাব সঙ্গে একান্ত হয়ে তার শাশতরূপটিকে দেখবেন এই তাঁর মনে উদগ্র বাসনা। বেরুলেন রামমোহন।

রামমোহন ভারত পরিক্রমায় যখন বেরুলেন, তখন বাড়ীতে তাঁর বালিকা বধূ।

শোনা যায় রামমোহনের তিন বিয়ে। প্রথম বার বিয়ে হয় তাঁর আট বছর বয়েসে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হ'লে তারপর বছরই তাঁর দ্বিতীয় বার বিয়ে হয়। দ্বিতীয়া স্ত্রী জীবিত থাকা কালে তাঁর তৃতীয় বার বিয়ে হয়। প্রথম স্ত্রীর নামের কোন উল্লেখ নেই কোন গ্রন্থে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম শ্রীমতী দেবী এবং তৃতীয়া স্ত্রীর নাম শ্রীমতী উমা দেবী।

ভারত-পথিক রামমোহন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে প্রত্যেকটি জাতির সঙ্গে মিশলেন, প্রত্যেকটি ধর্ম্মের সারকথা উপলব্ধি করলেন। প্রত্যেকটি ধর্ম্মগ্রন্থকে পাতি পাতি করে খুঁজলেন। কিন্তু কোথাও তিনি বহু

পৌত্তলিকতার খোঁজ পেলেন না। প্রতি জায়গায় একটি মাত্র ঈশ্বরের খোঁজ পেলেন। এক ব্রহ্ম সর্বভূতে বিরাজমান। দ্বিতীয় কোন দেবতার সন্ধান পেলেন না। আরও ঘুরলেন তিনি। ঘোরার আর শেষ নেই।

ঘুরতে ঘুরতে ভারতের উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে এসে হাজির হলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের নানা ধরনের গ্রন্থও পাঠ করে তার প্রতি প্রবল আস্থা জন্মে। সেইজন্য হিমালয় সংলগ্ন স্থানে এসে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল তিব্বতে যাওয়া স্থির করলেন। মনের মধ্যে উদগ্র বাসনা নিয়ে ব্রহ্মকে স্মরণ করে তার কৃপা ভিক্ষা করলেন।

সৌভাগ্য বশতঃ তিব্বত গামী এক অভিযাত্রীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে গেল। তিনি তাদের সঙ্গ লাভ করলেন। বেশ কিছুদিন ধরে যাবার পর ধর্ম্ম সম্বন্ধে সেই দলের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য উপস্থিত হ'ল। এমন একটা নাস্তিক লোককে দলে রাখা ঠিক হবে না এই ভেবে তারা রামমোহনকে দল থেকে তাড়িয়ে দিল।

রামমোহন দমবার পাত্র নন। অতি কষ্টে সেই দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করছেন। সম্পূর্ণ একজন অনাভিজ্ঞের পক্ষে একা এই রকম দুর্গম হিংস্র পশু সংকুল পথ অতিক্রম কত যে কষ্ট সাধ্য তা একমাত্র রামমোহনই সেদিন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতে পেরে ছিলেন।

শেষে তার যাত্রা পথ শেষ হ'ল। তিনি তিব্বতে পৌঁছুলেন। চোখে মুখে আনন্দের বন্যা। একমাত্র ব্রহ্মই তাঁকে রক্ষা করেছেন।

তিব্বতে গিয়ে হিন্দূধর্ম্মের মূল কথা ও সার-মর্ম্মকে জানিয়ে দিলেন তিব্বতীয়দের কাছে। নানা জায়গায় সভা সমিতি করে তিনি বক্তৃতা করতে লাগলেন। কিছুদিন এইভাবে চলার পর সেখানে তাঁর অনুরাগী ও ভক্তের দল বাড়তে লাগল।

হিন্দূধর্ম্মের মূল কথাটির সঙ্গে যখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূল কথাটি মিলিয়ে দিয়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জানালেন তখন রাম-মোহনকে নিয়ে তারা হৈ-হৈ করতে আরম্ভ করল।

একদিন এত খ্যাতির মাঝে এক বিড়ম্বনা এসে হাজির হ'ল। তাহ'ল—তিনি একদিন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান ভক্তদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন,—"আপনাদের লামাকে আপনারা ভগবান ভাবেন কেন?"

তিনি আরও বললেন,—"কোন মানুষ ভগবান নয়। যারা এভাবে নিজেকে লোক সমক্ষে ভগবান বলে জাহির করেন তিনি নিতান্ত ভণ্ড ছাড়া আর—কিছু নয়। ঈশ্বর নিরাকার। তাঁকে চোখে দেখা যায় না। অতএব আপনাবা 'লামা'-কে পরিত্যাগ করুন:

রামমোহনের মুখে তাদের লামার অপমান শুনে ভক্তেরা রাম-মোহনের, ওপর বাগে গর্‌গর্‌ করতে লাগল। একথা সারা তিব্বতে ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই রামমোহনকে খুঁজতে লাগল তার পরদিন থেকে। সামনে পেলে তাঁকে আর আস্ত রাখবে না তারা।

রামমোহন সেখানে এক গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গৃহিণী রামমোহনকে খুব দয়া দাক্ষিণ্য দেখিয়েছিলেন।

শোনা যায় একদিন রাত্রে কয়েক জন তিব্বতীয় রামমোহনকে হত্যা করার জন্য রাতের অন্ধকারে সেই গৃহস্থের বাড়ী আক্রমণ করবে এই খবর যখন গৃহিণী শুনতে পেলেন তখন তিনি রামমোহনকে সেই মুহূর্ত্তে বাড়ী ছেড়ে পালাতে নির্দ্দেশ দিলেন।

রামমোহন নিজের জীবনের জন্যে কোনদিন মায়া করেননি। তিনি ভাবলেন যে ব্রত তিনি গ্রহণ করেছেন, তাকে উদ্‌যাপন করার জন্যে তাঁর বেঁচে থাকার একান্ত দরকার।

ভারতের মানুষদের যে কঙ্কালসার দেহ তিনি দেখেছেন সেই দেহে মাংস গজান পর্যন্ত তাঁকে বেঁচে থাকতেই হবে।

আর কোন কিছু চিন্তা না করে সেই রাতের অন্ধকারে রামমোহন ভারতের পথে বেরিয়ে পড়লেন।

তিনি তিব্বতে মাত্র দুই বছর ছিলেন।

ভারত ভ্রমণ কালে রামমোহন শুধু মাত্র ধর্ম্ম পরিচয় সংগ্রহ করেননি। তিনি দেখেছেন ভারতবাসীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক,

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধূলা মলিন রূপটি। এর জন্যে এই কারণগুলির কথা বলা যেতে পারে,—নবাবী শাসন উঠে গিয়ে কোম্পানীর শাসন প্রবর্তন, ছিয়াত্তরের মনন্তর ঘটে গিয়েছে ভারতের বুক জুড়ে, ভারতীয় ভাষা তখন ভূমিষ্ট হয়নি বললেই হয়। সামাজিক রীতি নীতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এই সমস্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক জীবন যেন একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল।

তিনি তিব্বত থেকে ভারতে ফিরলেন ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে।

ওখান থেকে ফিরে রাধানগরে এলেন।

বাবা মা সাত পাঁচ বুঝে দেখলেন যে, রামমোহনের কোনরূপ পরিবর্তন আসেনি। বরং প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি আরও বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে—তাঁর মন। একান্ত নির্ভয়ে আবও বলিষ্ঠ স্বরে স্বীয় মত প্রচার করছেন।

পুনরায় পিতা পুত্রে সংঘর্ষ বাধল। পিতা রাগান্বিত হ'য়ে পুত্রকে পুনবায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

রামমোহন পুনবায় কাশী গেলেন। এবার তিনি একা নয় সঙ্গে তার স্ত্রী। কাশীতে গিয়ে বেদ-বেদান্ত পুনরায় গভীর ভাবে পাঠ করতে শুরু করলেন। তিব্বত থেকে ফিরে এসে বাড়ীতে থাকাকালীন তিনি লাঙ্গুলপাড়ায় রামকান্তের নোতুন বসতবাটিতে ছিলেন। ঐ অল্প দিনের মধ্যে তিনি স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ আয়ত্ব করেছিলেন। কাশীতে এসে বেদ-বেদান্ত নিয়ে পড়া শুরু করলেন। তার সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রও তন্ন তন্ন করে পাঠ করলেন।

তবে একটা কথা যে, কাশীতে থাকাকালীন স্ত্রী পরিবার নিয়ে ভীষণ অর্থকষ্টে পড়তে হ'ল তাঁকে। শুধু স্ত্রী নয় একটি পুত্র সন্তান হ'ল সেখানে। নাম রাখলেন রাধাপ্রসাদ। রাধাপ্রসাদই রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার। আয়ের পথ নাই। সংসার চালান একেবারে দুসাধ্য ব্যাপার। লোক মুখে রামকান্ত ছেলের আর্থিক

দুর্ভোগের কথা জানতে পারলেন। ঐ সময় পিতা কিছু অর্থ সাহায্য করতে চাইলে রামমোহন তা গ্রহণ করলেন না।

এত বিপদেও রামমোহন এতটুকু ধৈর্য্য হারালেন না। তখন থেকেই তিনি জীবন পথ ও লক্ষ্য স্থির রেখে চল্‌তে শুরু করেছেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান রামমোহন কারও কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণকে মর্যাদা হানিকর বলেই মনে করতেন।

কাশীতেই রামমোহনের ইংরাজী শেখার হাতে খড়ি। কোম্পানী আমলে বাস করে ইংরাজী না শেখা বোকামী। তাছাড়া সংসার চালাতে হ'লে তাঁকে উপার্জন করতে হবে। তাই ইংরাজী শেখা অপরিহার্য্য বলে মনে করলেন তিনি।

মেধাবী রামমোহন ইংরাজী ভাষাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্বে আনলেন।

অদম্য জ্ঞানস্পৃহা নিয়ে রামমোহন ইংরাজী তো বটেই তার সঙ্গে গ্রীক্, হিব্রু, লাটিন, উর্দু এবং ফরাসী ভাষা পর্যন্ত সুন্দর ভাবে আয়ত্বে আনলেন।

মাত্র তেইশ বছর বয়সে এতগুলি ভাষাকে একেবারে গুলে খেয়ে ফেলা রামমোহনের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। আজ পর্য্যন্ত এত কম বয়েসে পৃথিবীর কেউ দশটি ভাষাকে আয়ত্বে আন্‌তে পারেননি। এনেছিলেন একমাত্র রামমোহন।

রামমোহনের ইংরাজী শুনে ডিরোজিও সাহেব পর্যন্ত তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তার ইংরাজীতে রচনাগুলি এত বেশী বলিষ্ঠ ও সুন্দর ছিল যে আধুনিক বেশী বড় বড় পণ্ডিতেরা এত যুক্তি তর্ক দিয়ে তেমন সুন্দর ইংরাজী লিখতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে।

রামমোহনের ইংরাজীতে গভীর জ্ঞানের খবর পেয়ে অনেক গুনীজন তাঁর ভক্ত হলেন। এই সুযোগে তিনি নিজের ধর্ম্মমতকে তাদের সামনে তুলে ধরলেন। নোতুন সংস্কার মুক্ত ধর্ম্মের আসাদ পেয়ে অনেক বন্ধু বান্ধব রামমোহনের সঙ্গে হাত মেলালেন। ঈশ্বরের প্রতি

বিশ্বাসের মাত্রা বেড়ে গেল দেশবাসীর। আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর চরম শত্রু হ'য়ে দাঁড়াল বটে কিন্তু তিনি দমলেন না। পুরোদমে চলল মিথ্যা সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করতে।)

আঠারশ তিন সালের মে মাসে রামকান্তের মৃত্যু হ'ল। পিতার শিয়রে এসে দাঁড়ালেন রামমোহন।

পিতার পারিবারিক শ্রাদ্ধের সময় তিনি তাঁর মাতার সঙ্গে যোগদান করলেন না। তিনি স্বতন্ত্র ভাবে পিতার শ্রাদ্ধ করালেন।

রামমোহনের চলমান জীবনে আর বাধা সৃষ্টির লোক কেউ রইল না। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন।

শুরু হ'ল বহু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ পর্ব। তিনি প্রচলিত হিন্দু প্রথার বিরুদ্ধে বই লিখ্‌তে শুরু করলেন। বই ছাপাতে লাগল আর বিনা পয়সায় দেশের লোকের মাঝে বিলিয়ে দিতে লাগলেন।

এর ফলে এতদিন যারা বন্ধু ছিল তারাও রামমোহনের শত্রু হ'য়ে দাঁড়াল। এতটা বাড়াবাড়ি করবে এ ধারণা বন্ধুদের ছিল না। স্বার্থান্বেষী পণ্ডিতেরা দলে দলে তার বাড়ীতে এসে রামমোহনের বিধবা মায়ের কাছে এসে তার পুত্রের বিধর্ম্মী হওয়ার ফলে সমাজ যে উচ্ছন্নে চলে যাবে একথা জানালেন। অনেকে রক্ত চক্ষু দেখিয়ে প্রতিশোধ নেবার কথাও বলে গেল। আবার কেউ ধর্ম্মমতী মহিলাকে নানাভাবে বুঝিয়ে ধর্ম্মের ভয় দেখিয়ে রামমোহনকে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্যে উপদেশ দিলেন। এমন বিধর্ম্মী পুত্রকে জমিদারীর অংশ দিলে বিগ্রহ গোপীনাথের অবমাননা করা হবে। জমিদারী যা কিছু সবই তো গোপীনাথের দয়াতেই হয়েছে। নানা রকম কু-পরামর্শ দিয়ে তারিনীদেবীকে পুত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলল। রামমোহনের বিরোধী পক্ষেরা।

রামকান্তের মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী তারিনীদেবী জমিদারীর সবকিছু দেখাশোনা করছিলেন। এই সুযোগ নিয়েই রামমোহনের

বিরুদ্ধবাদীরা তারিনীদেবীকে রামমোহনের বিরুদ্ধে মামলা করার প্ররোচনা দিলেন। তাঁরা আরও বললেন যে, আইনে আছে যে, কোন পিতার যদি বিধর্ম্মী পুত্র থাকে তবে সে পিতার বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হ'তে বাধ্য। ধর্ম্মভীরু মহিলা তাদের কথায় বিশ্বাস করে রামমোহনের বিরুদ্ধে মামলা করে দিলেন।

অপূর্ব জিনিষ, মাতা পুত্রে মামলা।

রামমোহন যখন খবরটা পেলেন তখন তিনি বেশ আশ্চর্য হলেন। তিনি ভাবলেন যে, নিশ্চয়ই তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর মাকে প্ররোচিত করে এ-কাজ করিয়েছে।

একবার ভাবলেন মামলা চলাবেন না। মায়ের বিরুদ্ধে মামলার লড়া একেবারে শোভা পায় না। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ঠিক করলেন, এ মামলা তিনি লড়বেন। আত্মীয়-স্বজনদের ওপর রাগ করেই তিনি মামলা চালাবার ব্যবস্থা করলেন।

তারিনীদেবী ছেলেকে জানিয়ে দিলেন যে, সে বিধর্ম্মী সন্তান। আর সেইজন্যেই তাকে তার পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে। ধর্ম্মই তার কাছে বড়।

রামমোহন যথারীতি মামলা চালাবার সবকিছু ব্যবস্থা করলেন। কোর্ট কাছারী একদিকে আর অন্যদিকে সংস্কার মূলক কাজ। কি অদম্য শক্তি, কি দুর্জ্জয় মনোবল। তিনি একটুও বিচলিত হলেন না। শত্রু পক্ষ আদালতে প্রমাণ করতে চাইল রামমোহন বিধর্ম্মী। অতএব পিতার সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার নাই এবং থাকতেও পারে না।

রামমোহন আদালতে দাঁড়িয়ে অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে শত্রুপক্ষের সমস্ত মতামত কেটে দিলেন। তিনি বললেন,—"আমি মোটেই বিধর্ম্মী নই। হিন্দুধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম, আমি শুধু হিন্দুধর্ম্মকে কু-সংস্কার মুক্ত করতে চেয়েছি। আমি অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই।"

রামমোহন যে যুক্তি দিয়ে সেদিন আদালতে ব্যাপারটি বোঝালেন সে যুক্তিজাল ছিন্ন করার কোন ক্ষমতাই রইল না বিরোধী পক্ষের।

মামলার রায় বেরুল। রামমোহনের অকাটা যুক্তির ওপর ভিত্তি করে জজ-সাহেব রামমোহনের পক্ষেই রায় দিলেন।

মামলায় জেতার পর রামমোহন মায়ের কাছে গেলেন। তখন সবাই ভাবল রামমোহন বুঝি এবার পৈত্রিক সম্পত্তির ওপর দখল নেবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি মাকে কিছু বললেন না। তিনি শুধুমাত্র বললেন,—"মা তোমার বিধর্ম্মী সন্তানকে আশীর্বাদ কর যেন তোমার পুত্রের যাত্রা পথ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।"

মায়ের চোখে জল এল। তিনি বুঝতে পারলেন ছেলের প্রতি এতদিন ধরে যে দুর্ব্যবহাব করে এসেছেন তা তাঁব পক্ষে খুব অন্যায় হয়েছে। এবার তিনি বুঝলেন তাঁর আত্মীয়-স্বজনবা ছেলের বিরুদ্ধে ক্ষিপিয়ে দিয়েছিল তাঁকে।

স্বামীর মৃত্যুতে তারিনীদেবী অনেকদিন ধরে শোক ভোগ করেন, তার ওপর ছেলেব এমন মতি গতি দেখে তারিনীদেবীর মন আবও ভেঙ্গে যায় এবং তাব সঙ্গে সঙ্গে শবীরও। একা জমিদারী চালান এই বৃদ্ধ বয়সে আর সম্ভব হচ্ছিল না: সেইজন্যে তিনি ঠিক কবলেন শেষ জীবনটা তিনি পুবীধামে কাটিয়ে দেবেন।

তাই একদিন দিন দেখে পুরীধাম চলে গেলেন তারিনীদেবী।

শ্রীক্ষেত্র পুবীধামে বেশীদিন বেঁচে বইলেন না। মৃত্যুব আগে তিনি রামমোহনেব সঙ্গে দেখা কবলেন। ছেলের কাছে বিদায় নিতে এসে।

তিনি ছেলেকে বললেন,—"তোর কথাই ঠিক রাম। তোর-ধর্ম্ম বিশ্বাসেই তুই স্থির থাক, "ঈশ্বর এক এবং সত্য।"

তিনি আরও বললেন,—'আমাব ঠাকুরও মিথ্যা নয়। আমি ঠাকুর পুজো করে যা পেয়েছি তাও মিথ্য নয়।'

মাতা পুত্রের দুজনের চোখেই জল। মা শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে চলে গেলেন: কিছুদিন পরে শ্রীক্ষেত্রে পুরীতে তারিনীদেবী দেহ রাখলেন।

রামমোহনের জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হ'ল।

॥ ছয় ॥

এইবার রামমোহন উপার্জ্জনের চেষ্টা করলেন। খানিকটা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যেও বটে, তাছাড়া তিনি ভাবলেন যদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরী পাওয়া যায় তবে তাদের সংস্পর্শে এসে ইংরাজীকে আরও সুন্দর ও শুদ্ধ করে শেখা যাবে।

তখনকার দিনে কোম্পানী সরকারের অধীনে চাকরী পাওয়া বাঙ্গালীর সৌভাগ্যের বিষয় ছিল।

আগে তিনি যে ফার্সী ও আরবী ভাষা শিখেছিলেন, কোম্পানীর আমল আসতে সে আর কোন কাজে লাগল না। এখন কোম্পানীর সমস্ত কাজকর্ম্ম ইংবাজীতে হচ্ছে। অতএব ইংবাজীকে আরও সুন্দর ভাবে শেখা দরকার। অবশ্য তিনি তখনই যা ইংরাজীকে আয়ত্ব করতে পেরেছিলেন তৎকালীন কোন বাঙ্গালীই কবতে পারেনি। তা ছাড়া বই পড়ে ইংরাজী শেখা আর কাজকর্ম্মের মাধ্যমে ইংরাজীকে দেখা আলাদা ব্যাপার।

রামমোহনকে বেশীদিন চাকরী খুঁজতে হয়নি। তখন দেশের অনেকেই রামমোহনের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়েছিল। যশোহরের কালেকটার ডিগ্‌বী সাহেব যেদিন শুনলেন যে বামমোহন চাকরী খুঁজছেন, তখন তিনি রামমোহনকে আহ্বান জানালেন। রামমোহন ডিগ্‌বীর অধীনে কেরানীগিরির কাজ পেলেন।

শোনা যায় রামমোহন ডিগ্‌বী সাহেবের অধীনে চাকরী নেবার আগে তিনি ডিগ্‌বীর কাছ থেকে এক অঙ্গীকার পত্র লিখিয়ে নেন। তাতে এই কথাগুলি লেখা ছিল যে, কেরানী হিসেবে তার প্রতি যেন কোনদিন অসম্মান প্রদর্শন করা না হয়। ডিগ্‌বী সাহেব রামমোহনকে উক্ত অঙ্গীকার পত্র লিখে দিয়েছিলেন।

রামমোহন সর্বপ্রথম চাকরী করেন মুর্শিদাবাদে উডফোর্ড সাহেবের অধীনে। পিতার যখন মৃত্যু আসন্ন তখন তিনি উক্ত চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

ডিগ্‌বীর অধীনে কাজ শুরু হ'ল রামমোহনের।

সরকারের রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে রামমোহনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি উর্দ্ধতন মহলেব সুনজরে এসে পড়েন। কারণ ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি বিশেষ পারদর্শীতা দেখিয়েছিলেন। ছোট বেলায় পিতার কাছ থেকে জমিজমার ব্যাপার কিছু কিছু শিখেছিলেন। তাছাড়া বংশ পরমপরায় ঐ কাজই তাঁরা সবাই কবে গেছেন। তাঁদেরই রক্ত তো রামমোহনের শরীরে বইছে।

অসাধারণ সততা ও পারদর্শিতার জন্যে তার পদোন্নতি হ'ল। কেরানী থেকে দেওয়ানে।

ডিগ্‌বী সাহেবেব সঙ্গে রামমোহনের আর প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ রইল না। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল। দুজনেব মধ্যে হৃদয়ের আদান প্রদান ঘটল।

ডিগ্‌বী সাহেবের রচনা থেকে পাওয়া যায় যে, রামমোহন যখন কেবানীর পদে চাকরী গ্রহণ করেন তখন তিনি ইংরাজী ভাষা শুদ্ধভাবে বলতে বা লিখতে পারতেন না। ডিগ্‌বী সাহেব রামমোহনকে অতি যত্নের সঙ্গে ইংরাজী শেখালেন। বিনিময়ে রামমোহনও ডিগ্‌বীকে সংস্কৃত শেখালেন।

দেওয়ান রামমোহন সুন্দরভাবে ইংরাজীকে আয়ত্ব করার পর ইংরাজী পত্রিকার সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেন। ইংরাজী পত্রিকার প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিকে মনযোগ সহকারে পাঠ করে উপলব্ধি করতেন অনেক কিছু।

সেই সময় ফরাসীদেশে বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল। খেটে খাওয়া মানুষের বাঁচার দাবীতে রাজার বিরুদ্ধে বিপ্লব। খবর পড়ে রাম-মোহনের প্রাণ কেঁদে উঠল; পরাধীন ভারতের গরীব খেটে খাওয়া

মানুষের কথা চিন্তা করে। ভারতবাসীর ওপর কোম্পানীর অকারণ জুলুম। জোর করে কর আদায় করা। ভয়ে তারা কর দিতে বাধ্য হ'ত।

রামমোহন শুধু মাত্র চাকরী করেই সমস্ত সময় কাটাতেন না। হাতে সময় পেলেই তিনি জনসাধারনের মাঝে তিনি ব্রহ্মবাদ প্রচার করে হিন্দুশাস্ত্রের মূল সত্যটিকে তুলে ধরতেন।

বাংলা দেশের প্রতিটি জায়গায় তাকে ঘুরতে হ'ত। প্রতিটি গ্রামে গ্রামে তিনি খাজনা আদায় করতে যেতেন। গ্রামে গিয়েই তিনি ভারতের আসলরূপ উপলব্ধি করতে পারতেন। গরীবদের মিনতিপূর্ণ চোখের দৃষ্টি। চোখে মুখে হাহাকারের ছবি। আর সেরোস্তা দারদের তোষামোদ প্রিয়তা ও অসত্য প্রিয়তায় তাঁর বুক ভেঙ্গে যেত। অন্যদিকে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ঔদ্ধত্য, অশিষ্টাচার ও অভদ্রতা চারিদিকে একটা সর্বনাশের জ্বাল বিস্তার করে আছে তিনি দেখতে পেলেন।

রামমোহন কিন্তু স্বীয় উন্নত চরিত্রের বলে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার আদায় করে নিয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে।

রামমোহন যে গ্রামেই গেছেন। সেখানেই প্রচুর লোক জমা হ'ত তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যে। কিন্তু রামমোহন জানতে পেরেছিলেন যে কেউই তাঁর মতামতের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারত না। কারণ রামমোহনের ব্রহ্মবাদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মের অস্তিত্ব খুঁজে পেত না, সবকিছুই তাদের কাছে নোতুন বলে মনে হ'ত। রামমোহন তাদের অজ্ঞতা ঘোচাতে পারলেন না। সভা সমিতিতে লোক জমা হ'ত শুধু মাত্র ভয়ে। কারণ দেওয়ান রামমোহনের ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক কিছু করার ক্ষমতা ছিল। এই কথা চিন্তা করে রামমোহনের মন মেজাজ আরও খারাপ হ'য়ে গেল।

তিনি বুঝলেন ভয়ে ভক্তি জিনিষটা খুব খারাপ। যতদিন পর্যন্ত দেশের লোক অন্তর দিয়ে, নিজেদের চেতনা দিয়ে ধর্ম্মের আসল রূপটিকে

উপলব্ধি করতে না পারবে, ততদিন এভাবে সভা সমিতি করে কোন লাভ হবে না।

তিনি ভাবলেন কি করে দেশের মানুষকে কাল নিদ্রা থেকে ওঠান যায়। মহা ভাবনায় পড়লেন রামমোহন। আরও ভাবনায় পড়লেন দেশের লোকের আর্থিক দুরবস্থার কথা ভেবে।

গ্রামের অবহেলিত কৃষকরা জমিদারের জমি চষে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পরিশ্রম করে যে ফসল ফলায়, সে ফসল ওঠে জমিদারের গোলায়। অথচ অনাহারে থেকে জীবনী শক্তি তারা হারিয়ে ফেলছে আস্তে আস্তে।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে দেশের জমিদারদেব চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছে খুব ভাল কথা। কিন্তু গরীব চাষীদের সঙ্গে জমিদারদের কেন কোন বন্দোবস্ত হয়নি? কেন একদল লোক সারা জাবন সুখ নিদ্রায় দিন কাটাবে আর একটা দল মাঠের কাজ করে ঘুমোবার সময়ই পাবে না?

বামমোহনের মাথায় প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। এই কথাটাই চাষীদের বোঝাতে হবে। ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তারাও ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব। প্রকৃতির সমস্ত কিছু জিনিষের প্রতি তাদেরও সমান অধিকার।

এ অন্যায়ের প্রতিরোধ তাঁকে করতেই হবে। তিনি স্থির করলেন রাজার কাছে নালিশ জানিয়ে এর একটা প্রতিবিধান করবেন।

তিনি সত্য সত্যই নালিশ ঠুকে দিলেন। ইংরাজীতেই লিখলেন তিনি।

একদিন অফিসে বসে ইংরাজী খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তাতে আছে ফরাসী বিপ্লবের কথা। ফরাসী জনগন লিখেছিলেন যে, তারা মানুষের মত বাঁচতে চায়, তারা চায় চিরদিনের জন্যে মুক্তি। ফরাসী দেশে ঐ কারণে খেটে খাওয়া মানুষরা রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছে। জয় তাদের অবশ্যম্ভাবী।

খবর পড়ে রামমোহনের মন অস্থির হ'য়ে উঠল। তিনি সঙ্কল্প করলেন সারা ভারতে তিনি বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দেবেন। নোতুন মন্ত্রে দীক্ষা দিতে হবে দেশবাসীদের। খেটে খাওয়া মানুষরা কোম্পানীর হাতের পুতুল হ'য়ে চিরদিন থাকবে না। সমাজের যত কিছু আবর্জনা ধুয়ে মুছে ফেলতে পারলে তবেই দেশবাসীদের নোতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হবে। আগে চাই ঈশ্বরের কৃপা, তাঁর কৃপা পেতে হ'লে ঈশ্বরকে জানতে হবে, তাঁর মহিমা উপলব্ধি করতে হবে। কিন্তু কুসংস্কার যুক্ত ধর্ম্মীয় প্রথাগুলো যতদিন থাকবে ততদিন ঈশ্বরকে জানা সম্ভব হবে না। মানুষ এখনও জানতে পারল না মানুষের মাঝেই ব্রহ্ম বিরাজমান। কতকগুলো গোঁড়ামীকে মনের মধ্যে পুষে রাখলে জাতির মুক্তি নাই।

রামমোহন চাকরী ছেড়ে দিয়ে মানুষের মনে ধর্ম্মভাব জাগাবার মনস্থ করেন। চাকরী করতে করতে এ জিনিষ করা সম্ভব নয় ভাবলেন তিনি। তিনি কোলকাতায় ফিরে গিয়ে স্বীয় ব্রহ্মবাদ আরও জোরদার ভাবে প্রচার করবেন ঠিক করলেন। 'যেই কথা সেই কাজ' তিনি কোম্পানীর চাকরী ছেড়ে দিয়ে কোলকাতায় চলে এলেন।

## ॥ সাত ॥

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন এলেন কোলকাতায়। বয়েস তখন তাঁর চল্লিশ। মানিকতলায় তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই রামলোচন রায়ের বাড়ীতে তিনি উঠলেন। রামলোচন রামমোহনের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।

তিনি কোলকাতায় এসে দেখলেন সে এক দারুণ অরাজকতার রাজত্ব চলেছে। ইংরাজরা কতগুলো নিরক্ষর ও অজ্ঞান হিন্দুকে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণের জন্যে উত্তেজিত করেছে যার ফলে দলে দলে অনেকে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করছে। তিনি ভাবলেন হিন্দুজাতীর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। তিনি পুস্তক রচনা করলেন। সভা সমিতি করে সবাইকে বোঝালেন। তিনি বললেন যে পুতুল পূজো করলে এবং গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দিলে প্রকৃত ধর্ম্ম পালন করা হয় না। কোন শাস্ত্রেই কোন মানুষকে পুড়িয়ে মারার কথা বলা হয় নাই। এসব সামাজিক কুসংস্কার। এ সব এক ধরণের পাপ।

রামমোহনের প্রকাশিত পুস্তক পড়ে এবং প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা শুনে খৃষ্টানরা এবং গোঁড়া হিন্দুরা তাঁর ওপর ভীষণ ভাবে চটে গেলেন। তারা কারও কথা শুনল না ইচ্ছামত কাজ করলেন।

রামমোহন বাংলা দেশের সমাজ জীবনের হৃৎস্পন্দন অনুভব করলেন। হিন্দু সমাজের স্তরে স্তরে প্রত্যক্ষ করলেন শোচনীয় বাস্তব চিত্র।

সেই জন্যে তিনি নিজে এক নোতুন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করলেন। তার নাম দিলেন "ব্রাহ্মধর্ম্ম"। তাঁর নোতুন ধর্ম্মের মূল কথা ঈশ্বর এক, যে ঈশ্বর। সেই ব্রহ্ম। 'ব্রহ্ম' থেকেই "ব্রাহ্মধর্ম্ম"।

রামমোহন মানিকতলার বাড়ী থেকেই 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। বাড়ীতে বসে তিনি বহু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বই প্রকাশ করলেন, সতীদাহ প্রথায় যে মানুষ পাপের বোঝা বাড়াচ্ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকেই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে—এই সমস্ত কথাগুলি সন্নিবেশিত করলেন তাঁর পুস্তকে।

রামমোহনের পুস্তক পড়ে অনেকেই তার সারমর্ম্ম উপলব্ধি করলেন, আবার অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মকে জাহান্নামে দেবারও ব্যবস্থা করলেন। নানা রকম ভাবে তাঁর বিরুদ্ধ বাদীরা রামমোহনের রচিত পুস্তক মিথ্যে বলে প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর বাড়ীতে উৎপাত শুরু হ'য়ে গেল। বাড়ীতে ঢিল পড়তে শুরু হ'ল।

রামমোহন ঐ সমস্ত নীরবে সহ্য করে গেলেন। তিনি রঘুনাথ পুরের বাড়ীতে গিয়ে বসবাস শুরু করলেন। তিনি ব্রহ্মের নামে সেখানে একটি বেদী নির্ম্মাণ করালেন। বেদীতে খোদাই করলেন—"একমেবাদ্বিতীয়াং।"

রঘুনাথপুরের বাড়ী ছিল রামমোহনের পৈতৃক সম্পত্তি। রামকান্ত মৃত্যু সময় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন। যদিও রামমোহনের সঙ্গে তাঁর পিতার ধর্ম্মের ব্যাপারে একেবারেই মিল ছিল না। তবু তিনি রামমোহনকে তাঁর সম্পত্তি থেকে বিচ্যুত করেননি।

লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ী জগমোহন ও রামমোহনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন, কোলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ী রামমোহনের একার নামে করে দিয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় রামকান্ত পুত্রকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও রামমোহনের ওপর তাঁর স্বাভাবিক প্রীতির বন্ধন চিরদিন ছিল। রামমোহন পিতার মৃত্যুর পরও কোনদিন সংবাদ নেননি যে তাঁকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে—কি, না। রামমোহন তাঁর পিতার মৃত্যুর কুড়ি বছর পর তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি গ্রহণ করেন।

সেই হিসাবে রঘুনাথপুরের বাড়ীর ওপর স্বীয় অধিকার থাকার ফলে সেখানে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের চিহ্ন স্বরূপ বেদী প্রস্তুত করালেন।

কিছুদিন পর রঘুনাথপুরের বাড়ী ছেড়ে পুনরায় কোলকাতায় এলেন। মানিকতলায় নোতুন বাড়ী কিনে ব্রাহ্মধর্ম্মেব কেন্দ্রস্থল তৈরী করলেন। তিনি বুঝেলেন যে তাঁর অভিষ্ঠ সাধনের জন্যে কোলকাতাই উপযুক্ত জায়গা। পাড়াগাঁয়ে থেকে তাঁর বহুমূখী প্রতিভার স্ফূরণ সত্যই সম্ভব হ'ত না।

তাঁর মানস জীবনের ওপর তিনটি ধর্ম্মের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ছিল। মুসলিম সাধনা, হিন্দু সাধনা ও খৃষ্ট ধর্ম্মের গভীবে প্রবেশ করে সর্বজনীন সংস্কার মুক্ত হয়েছিলেন তিনি। তিনি ধর্ম্মের মূল সূত্রকে সামনে রেখে এক নোতূন আদর্শকে সুষ্ঠভাবে রূপায়িত করার জন্যে এবং তা প্রচার করার জন্যে বাড়ীতে আত্মীয় সভা---তৈরী করলেন। এই আত্মীয় সভা রামমোহনের সংস্কারক জীবনেব সর্বপ্রধান কীর্ত্তি।

আত্মীয় সভা তৈরী করলেন ১৮১৫ সালে।

এই আত্মীয় সভার মঞ্চ হতেই তিনি নবজাগরনের শঙ্খধ্বনী করেছিলেন। এই সভার তিনটি উদ্দেশ্য ছিল—

আধ্যাত্মিক উন্নতি, জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রচার এবং লোকমত গঠন। তাঁর অনুগামী ও বন্ধুগণ যথা—দ্বারকানাথ ঠাকুর, নন্দকিশোর বসু, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণীরা এই অধিবেশনে যোগ দিলেন।

আত্মীয় সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি পাঠ করা হ'ত।

বড় বড় হিন্দু পণ্ডিতরা মাঝে মাঝে সেই সভায় যোগ দিয়ে রামমোহনের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হতেন। প্রায়ই তর্ক যুদ্ধ চলত তাঁদের। তবে রামমোহনকে কোনদিন কোন হিন্দু পণ্ডিত যুক্তিতর্কে হারাতে পারেন নি।

বেদ, উপনিষদ, গীতা, দর্শন প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে তুমুল

তর্ক বেঁধে যেত। শেষে হিন্দু পণ্ডিতরাই নাস্তা নাবুদ হ'য়ে ফিরে যেতেন।

অদ্বৈতবাদী রামমোহন প্রতি বারই তর্কে জয়যুক্ত হতেন। এতে আরও একটা সুবিধে হয়েছিল। অনেকেই তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন সেদিন। আবার অনেকে স্বেচ্ছায় এসে তার সভায় যোগ দিতে লাগলেন।

ক্রমে ক্রমে রামমোহনের পাঁচ শ' অনুরাগী হ'ল। এমন একটি শক্তিশালী ও অনুরক্ত গোষ্ঠী পাওয়ায় রামমোহন সংস্কার আন্দোলনকে জোরদার করে তুললেন।

মহামতি ডেভিড হেয়ার পর্যন্ত রামমোহনের সভায় বিনা আমন্ত্রণে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত রামমোহনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

রামমোহন শুধুমাত্র হিন্দু তর্কবাগীশদের সঙ্গেই তর্ক করে ক্ষান্ত রইলেন না। তিনি বড় বড় পাদ্রী পণ্ডিতদের সঙ্গেও তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে লাগলেন। খৃষ্টান ধর্ম্মের মুল কথাটির বাইরে যে তারা চলে গেছেন এই কথাটি তাদের সেদিন জানিয়ে দিলেন রামমোহন। এর ফলে অনেক ইংরাজও তার শত্রু হ'য়ে দাঁড়াল।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের ফলে একদিন যেমন অনেক হিন্দু, পাদ্রীদের কথা শুনে দলে দলে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করতে চলেছিল, তেমনি রামমোহনের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের ফলে অনেকেই স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে ধর্ম্মান্তরিত হলেন।

পাদ্রীরা আর ততটা সুবিধে করতে পারল না। তারা ভেবেছিল একে একে সমস্ত ভারতবাসীদের খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করাবেন। কিন্তু বাদ সাধলেন রামমোহন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটা পত্রিকা শ্রীরামপুরে প্রকাশ করা হ'ত, তাতে পাদ্রীরা রামমোহনের বিরুদ্ধে নানা রকম গালাগালি ও কুৎসা প্রচার করলেন। রামমোহন ও পাদ্রীদের সমুচিত জবাব দেবার জন্যে 'ব্রাহ্ম পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। তাতে তিনি লিখলেন যে, হিন্দুরা

যেমন বহুদেবদেবীর উপাসনা করে তেমনি খৃষ্টানরাও একমাত্র ঈশ্বর মেনে চলে।

হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে সুন্দর সাদৃশ্য দেখানর ফলে পাদ্রীরা আরও চটে গেলেন রামমোহনের ওপর।

শোনা যায় একবার খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক বিশপ মিডলটন রামমোহনকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে খৃষ্টান করতে চেয়েছিলেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। মিডলটনের কথা শুনে রামমোহন অনেক ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করলেন। রামমোহন কোনদিন মিডলটনের মুখ দর্শন করেননি।

খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদ প্রচার করার জন্যে এ্যাডাম সাহেব এক কমিটি গঠন করেন। কোলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরাজ ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী এই কমিটি সদস্য হন। কমিটির নাম ছিল 'ইউনিটেরিয়ান কমিটি'। রামমোহন ও পুত্র রাধাপ্রসাদ এই কমিটির মধ্যে যোগ দিলেন। এখানে এক ঈশ্বরের উপাসনা হ'ত। এখানে ধর্ম্মজাতি নির্বিশেষে সবাই আসত কিন্তু উপাসনা হ'ত শুধু এক ঈশ্বরের। এখানে খৃষ্টান হিন্দুর কোন প্রভেদ ছিল না।

রামমোহন নিজের ভক্ত ও অনুগামীদের নিয়ে উক্ত প্রার্থনা সভায় গিয়ে প্রার্থনা করে আসতেন। একবার রামমোহনের কয়েকজন হিন্দু ভক্ত অনুচর পরামর্শ দিলেন যে, তারাও 'ইউনিটেরিয়ানের' মত একটি উপাসনা গৃহ করবেন।

রামমোহন রাজি হলেন এ প্রস্তাবে। সঙ্গে সঙ্গে কাজ। জোড়াসাঁকোর একটি ভাড়া বাড়ীতে উপাসনা গৃহ স্থাপিত হ'ল। সমবেত ভাবে ওখানেই উপাসনার ব্যবস্থা হ'ল। এই উপাসনা সভা ও বাড়ীতে বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। তিনি নিজে জায়গা কিনে স্বতন্ত্রভাবে ওর পাশেই উপাসনা গৃহ তৈরী করালেন। এই সমাজগৃহের নাম দিলেন 'ব্রাহ্ম সমাজ'।)

এটী তৈরী হ'ল ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে।

শনিবারের পরিবর্ত্তে বুধবার উপাসনার দিন স্থির হ'ল।

সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে এক কুঠিরিতে বেদ পাঠ করা হ'ত, সেখানে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা যেতে পারত।

গৃহের যে প্রশস্ত ঘরটিতে সমাজ বসত সে ঘরে প্রথমে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য উপনিষদের ব্যাখ্যা করতেন; তারপর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মশায় বেদান্তের ভাষ্য দিতেন। তারপর ব্রহ্মসঙ্গীত হ'য়ে সভা ভেঙ্গে যেত।

একেশ্বরবাদী রামমোহনের ধর্ম্মসাধনার মর্ম্মবাণী তাঁর রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটির মধ্যে সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে।

"কি স্বদেশে, কি বিদেশে, যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।"

দৈনন্দিন ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মপন্থায় অনেকে আকৃষ্ট হ'য়ে অযাচিত ভাবে বহু জ্ঞানীগুনী এসে যোগ দিতে লাগলেন।

রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার খৃষ্টানদের পীড়ার কারণ হ'য়ে দাঁড়াল। সেইজন্যে ইংরাজী পত্রিকাতে রামমোহনের বিরুদ্ধে নানা রকম মজার মজার গল্প লেখা হ'ল। রামমোহন এতে দমলেন না। তিনি তাদের সমুচিত জবাব দেবার জন্যে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেট' নামে এক পত্রিকার সম্পাদক হলেন। কোলকাতা ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনের কর্ত্তা এ্যাডাম্ সাহেব রামমোহনের অনুরক্ত হ'লেন। রামমোহনের নোতুন ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

এর থেকে বোঝা যায় রামমোহনের নোতুন ধর্ম্মের প্রভাব হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। খৃষ্টানদের মনও জয় করেছিলেন তিনি।

॥ আট ॥

তৎকালীন হিন্দু সমাজে পাঁচটি কু-প্রথা প্রচলিত ছিল।

( ১ ) জাতিভেদ, ( ২ ) অস্পৃশ্যতা, ( ৩ ) বহুবিবাহ, ( ৪ ) বাল্য বিবাহ, এবং ( ৫ ) সতীদাহ।

সতীদাহ প্রথাকে নিয়েই রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন জোরদার হ'য়ে উঠেছিল।

ছোটবেলায় স্বচক্ষে স্বামীর চিতার মাঝে কুসুম কোমল স্ত্রীর দেহখানিকে জোর করে তুলে দিতে দেখেছেন তিনি। নারীজাতির প্রতি এ রকম অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরতার কথা রামমোহনের স্মৃতিতে গাঁথা ছিল। তাই আজও নারীজাতির প্রতি তাঁর হৃদয় ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠছে।

তিনি ভাবলেন জীর্ণ খোলস পরা ব্রাহ্মণেরাই এর জন্যে দায়ী। এই প্রথাকে তুলতে পারলে, সেটাই হবে তাঁর জীবনে সবচেয়ে বৃহৎ ও মহৎ কাজ। সেই অবলা নারীর আকুল ক্রন্দন ও হাহাকার রামমোনের অন্তরে আঘাত হান্‌তে লাগল।

তিনি পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্ম্মগ্রন্থকে পাতি পাতি করে খুঁজে দেখতে শুরু করলেন, কিন্তু কোথাও এমন কথার উল্লেখ পর্যন্ত পেলেন না।

তিনি লিখতে শুরু করে দিলেন আর্তনারীর মর্ম্মন্তুদ নির্যাতনের কাহিনী।

তিনি ইংরাজীতে, ফার্সীতে ও আরবীতে লিখলেন, কিন্তু বাংলা গদ্যের আকারে এর আগে তিনি কোনদিন কোন রচনা প্রকাশ করেননি। তিনি নোতুন বাংলা গদ্য তৈরী করলেন। এর আগে কেউ গদ্যের আকারে কোন কিছু রচনা পড়েও নি আর দেখেও নি।

রামমোহন সেদিনই বাংলা গদ্যের জন্ম দিলেন। যে গদ্য একদিন বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি তৈরী করেছিল, সেই বাংলা আজ ভিন্নরূপ নিয়ে আমাদের সামনে বিদ্যমান। আজ যে গদ্য সাহিত্যের এত কদর তার জন্যে একজনকেই বাহবা দিতে হয়, তিনি রামমোহন।

সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে রামমোহন বহু পুস্তক রচনা করলেন। ইংরাজীতে, বাংলায় মিলে তিনি প্রায় সত্তর খানা পুস্তক লিখলেন।

রামমোহন বুঝতে পারলেন বেদান্তের সারকথা মানুষকে বোঝাতে গেলে বেদান্তের অনুবাদ দরকার। বেদান্ত সংস্কৃতে লেখা বলে তা সাধারণের বোধগম্য ছিল না। সেইজন্যে তিনি ওটা ইংরাজী ও হিন্দীতে অনুবাদ করলেন। অবশ্য বেদান্তের সার সংকলনের অনুবাদ।

সংস্কার আন্দোলনকে ব্যাপক করবার জন্যে বেদান্তসারের ইংরাজী অনুবাদ ইংলণ্ডে ডিগ্‌বী সাহেবকে পাঠালেন। এর দ্বারা তিনি এই আন্দোলনকে সর্বভারতীয় করেছিলেন।

এর পরের বছর রামমোহন পাঁচখানি উপনিষৎ বাংলা অনুবাদ সহ আত্মপ্রকাশ করলেন। এগুলোকে তিনি ইংরাজীতেও অনুবাদ করেছিলেন। প্রত্যেকটি গ্রন্থ ছাপাতে যা ব্যয় হ'ত তা তিনি নিজের অর্থকে ব্যয় করেই করতেন। এই সব গ্রন্থ ছাপাবার পরই তিনি কিছু গ্রন্থ বিদেশে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন।

বিদেশের বড় বড় মনীষীদের কাছ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপক গাদা গাদা চিঠি আসতে লাগল রামমোহনের কাছে। পাশ্চাত্য দেশ তাকে একজন মহাজ্ঞানী ধর্ম্ম-সংস্কারক বলে অভিনন্দন জানাল।

নিজের দেশে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি হ'ল। প্রাচীন দল তাঁদের সম্মিলিত শক্তি রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে গেলেন। বড় বড় পণ্ডিতরা তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। রামমোহন এটাই চেয়েছিলেন। একটি ঘুমন্ত জাতি তাদের আলস্য নিদ্রা থেকে জেগে উঠুক, এটাই তিনি চেয়েছিলেন।

রামমোহন অকাট্য যুক্তি দিয়ে বড় বড় পণ্ডিতদেব তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দিলেন। অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, গভীর পাণ্ডিত্যের কাছে মুখোসধারী পণ্ডিতদের পরাজয় তাদের আরও রাগান্বিত করে তুলল।

তৎকালীন কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত রামজয় তর্কালঙ্কার রামমোহন রচিত পুতুল পূজার বিরুদ্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, সেই গ্রন্থগুলোর অসারতা প্রমাণ করবার জন্যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' নামে পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি পুতুল পূজোর প্রয়োজনীয়তার কথা তাতে সন্নিবেশিত করেছিলেন।

রামমোহন এবার বচনা করলেন 'ভট্টাচার্যের-বিচার'। সম্ভবতঃ মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতই ভট্টাচার্য মশায়ের ভূমিকায় ছিলেন। এটা ছিল একটা কৌতুক গ্রন্থ।

রামমোহনের সংস্কার অভিযানে অনেক ব্যাঘাত সৃষ্টি হ'তে লাগল। উগ্রপন্থী হিন্দু ও পাদ্রীরা এক জোট হ'য়ে রামমোহনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, কিন্তু রামমোহন তাদের তোয়াক্কা করলেন না।

খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ থেকে অনেকগুলো উপদেশ সংগ্রহ করে তিনি 'খৃষ্টীয়-উপদেশ' নামক এক গ্রন্থ বচনা করলেন। এতে খৃষ্টানদের কুসংস্কারগুলোকে তিনি অত্যাধিক যত্ন সহকারে লোক সমক্ষে তুলে ধবলেন। একবার মার্সম্যান সাহেব রামমোহনের কাছে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, কিন্তু তিনি রামমোহনের কাছে হেরে গিয়ে নাজেহাল হ'য়ে ফিরে যান। রামমোহনকে এইভাবে নানা দিক দিয়ে তিনি বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু যুক্তিবাদী রামমোহনের কাছে সব কিছু তার নিষ্ফল হ'য়ে গিয়েছিল।

এরপর সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের জন্যে তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। তিনি নানা রকম যুক্তি খাড়া কবে বড়লাটসাহেবের কাছে লিখলেন যে এটি একটি সামাজিক কু-প্রথা, শাস্ত্রে এ প্রথার কোন উল্লেখই নাই। তাঁর যুক্তির সপক্ষে অজস্র প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করলেন। বড়লাট সাহেব যাতে করে এমন অসামাজিক প্রথাটিকে

উঠিয়ে দেন সে বিষয়ে তিনি তাঁর কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করলেন।

ঐ সময়ে সহমরণ প্রথার বিরোধীতা করে তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করলেন। দু'টি গ্রন্থই রচনা হয়েছিল। একটি "প্রবর্তক নিবর্তকের সম্পদ' ও 'গোস্বামীর সঞ্চিত বিচার।' গ্রন্থ দু'টিকে সর্ব সাধারণ্যের মাঝে প্রচার শুরু করলেন।

রামমোহনের লেখনীর জবাবে, একরকম রামমোহনকে ঠাট্টা করেই তাঁর বিরোধী পক্ষ একটি গ্রন্থ রচনা করলেন, সেটি হচ্ছে 'পাষণ্ড ও পীড়ন'।

রামমোহনও ছেড়ে কথা কইলেন না। ঐ গ্রন্থের পাল্টা জবাব দিলে "পথ্য প্রদান" গ্রন্থ রচনা করে।

কোম্পানী শাসনের প্রথম দিকে একবার সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্ট কোলকাতা শহরে সতীদাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোলকাতার অধিবাসীরা শহরের বাইরে গিয়ে ঐ কাজ সম্পাদন করে আসত। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি যখন গর্ভনর-জেনারেল তখন তিনি নিজামত আদালতে চিঠি দিয়ে জান্‌তে চেয়েছিলেন যে, সহমরণ প্রথাটি হিন্দুদিগের কিরকম প্রথা!

নিজামত আদালতের জজেরা পণ্ডিতগণের সঙ্গে যুক্তি করে সেই চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন যে, গর্ভবতী, ঋতুমতী, নাবালিকা বা শিশু সন্তানবতী বিধবার সহমরণ শাস্ত্র সম্মত নয়।

এর কিছুদিনের পরেই ওয়েলেসলি পদত্যাগ করেছিলেন তাঁর সময়ে সতীদাহ বিষয়ে কিছু হয়নি।

এরপরে এলেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে সরকার আবার বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করেন। তখন সকল শ্রেণীর হিন্দুরা সতীদাহ প্রথা প্রচলিত রাখার সম্মতি জানান এবং বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কোম্পানী তখন হিন্দুধর্ম্মের ওপর হস্তক্ষেপ করতে ভয় পেলেন।

তখন থেকেই রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করে অগ্রসর হতে লাগলেন।

তখন ছিল ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ।

লর্ড হেষ্টিংস সতীদাহ প্রথার ব্যাপারে কিছুদিন মাথা ঘামিয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে সেটা ধামা চাপা পড়ে যায়। হেষ্টিংস-এর পরে এলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং!

বেন্টিং ছিলেন নিজে সমাজ সংস্কারক। তাছাড়া বিলেতে বসে তিনি রামমোহন রচিত অনেকগুলি পুস্তক পড়েছিলেন এবং সেদিন থেকেই তিনি অন্তরের সঙ্গে রামমোহনকে সমর্থন করেছিলেন।

বেন্টিং সমগ্র বিষয়টিকে নিয়ে অনুধাবন করলেন। তিনি সর্ব প্রথমে রামমোহনের সঙ্গেই আলোচনার জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। রামমোহনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন বেন্টিং। নান কথার মাঝে রামমোহন সতীদাহের ব্যাপারটি পাড়লেন। রামমোহন ঐ সঙ্গে তিনখানি বই বেন্টিংকে উপহার দিলেন।

রামমোহনের আরও যে সমস্ত জ্ঞানীগুনী অনুরাগী ছিলেন তাঁরাও একযোগে বেন্টিংকে এসে ধরলেন। বেন্টিং সেদিন তাঁর হৃদয়ের মহানুভূতি মিশিয়ে নারী পীড়নের প্রথাটিকে আইন করে তুলে দিলেন। এ ঘটনা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের।

সতীদাহ প্রথা নিবারণের সাথে সাথে এ-কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে নারী শুধু মাত্র পুরুষদের ভোগবিলাসের সামগ্রী ছিল, সেই নারীর সেদিন পৃথক অস্তিত্বের মর্যাদা প্রথম স্বীকৃত হ'ল।

তারপর রামমোহন 'সিবিল ও মিলিটারী উইডোবা ফাণ্ড' সমিতির অনুসরণে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল যে, স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায় অবস্থার জন্যে বহু বিধবা যে অসহনীয় দুঃখ দুর্দশা ভোগ করত তাদের দুঃখ মোচন করা।

উপরি উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে রামমোহন কতখানি দুরদর্শী ও আদর্শবাদী ছিলেন।

॥ নয় ॥

সতীদাহ প্রথা তুলেই রামমোহন ক্ষান্ত থাকলেন না।

বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, কন্যাপন, কৌলিন্য এই সমস্ত প্রথা সমাজে চালু থাকার ফলে বাংলা দেশের মেয়েদের দুর্গতির আর সীমা ছিল না। রামমোহন সেই সমস্ত অবাঞ্ছনীয় প্রথাকে কঠোর হস্তে দমন করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কন্যাপন ও কন্যা-বিক্রয় এই সমস্ত কু-প্রথার বিরুদ্ধে তিনি শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করে নিজে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করলেন। স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর পূর্ণ অধিকারের জন্য তিনি সরকারের কাছে অনেক লেখালেখি করলেন। তারই সুফল স্বরূপ আজ আমরা প্রত্যক্ষ করি হিন্দু কোড বিলে।

বিধবা বিবাহের ব্যাপারে প্রচলিত প্রথার শিরে যে আঘাত সেদিন তিনি হেনেছিলেন, পরবর্ত্তীকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই আন্দোলনকে সফল করে তুলেছিলেন। তিনি নিজের এক বন্ধুর সঙ্গে একজন বিধবা মহিলার বিয়ে দিয়েছিলেন।

অন্ধকাব যুগের একমাত্র পথিক রামমোহন হিন্দু সমাজকে সহস্র নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্যে জীবনপন করে লড়াই করলেন।

তিনি এবার ভাবলেন দেশের লোকের শিক্ষার কথা। ইতিমধ্যে ইংরাজ সরকার হিন্দুদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার করছিলেন। রামমোহন তাতে বাদ সাধলেন। তিনি সরকারকে বললেন, —"দেশের লোককে সংস্কৃত শিখিয়ে ওদের আরও পঙ্গু করে দিও না।"

তিনি চিন্তা করলেন যে দেশের লোককে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত

করে তুলতে না পারলে তারা সরকারের কাজকর্ম্ম বুঝতে পারবে না। কারণ তখন সরকারী সমস্ত কাজ ইংরাজী ভাষায় হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিদেশের সমস্ত কিছুকে জানার জন্যে ও বিদেশের সঙ্গে সকল বিষয়ে সম্পর্ক রাখার জন্যে ইংরাজী ভাষা শেখা একান্ত দরকার

পৃথিবীর কাছে ভারতের জন্যে সর্বকালের দ্বার খুলে রাখতে গেলে বলিষ্ঠ ইংরাজী ভাষাকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া দরকার।

রামমোহনের এই প্রচেষ্টার মাঝে বন্ধু হ'য়ে এসে দাঁড়ালেন মহামতি ডেভিড হেয়ার। দুজনের সমবেত চেষ্টায় কোলকাতায় হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা মাদ্রাসা তৈরী হ'ল। রামমোহন নিজে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মিশনারী বেররেণ্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটি মিশনারী স্কুল স্থাপন করেন। এটাই ছিল তখনকার দিনে প্রথম ইংরাজী স্কুল।

রামমোহন যে ইংরাজী স্কুলটি স্থাপন করলেন তার নাম দিলেন 'য়্যাংলো হিন্দু স্কুল'। এটি স্থাপিত হয় ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে। এখানে বিনা বেতনে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। তারপর হেদুয়ার কাছে একটি জায়গা কিনে রামমোহন নিজ ব্যয়ে একটি স্কুল তৈরী করলেন। দুজন শিক্ষক নিযুক্ত করলেন ঐ স্কুলে শিক্ষা দেবাব জন্যে। তাদের মাইনের ব্যবস্থা করলেন তিনি। একজনকে মাসিক একশত টাকা এবং অপর জনকে মাসিক আশী টাকা দেবার ব্যবস্থা করলেন। এই স্কুলে আশীজন ছাত্র পড়তে শুরু করল।

স্কুলে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ফরাসী চিন্তা নায়ক ভলতেয়ারের 'সুইডেনের দ্বাদশ চার্লসের ইতিহাস' নামক পুস্তকটি স্থান পেয়েছিল।

এখানে একটু বলা প্রয়োজন যে ফরাসী বিপ্লবের আগুনের সামান্য পরিমাণ আঁচ লাগবারও প্রয়োজন ছিল ভারতবাসীর শরীরে।

তখন বিখ্যাত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক ডাফ্ সাহেব একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপনের জন্যে একটি বাড়ী খুঁজছিলেন, রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের

একখানা ঘর ছেড়ে দিলেন তাঁকে। প্রত্যেকটি স্কুলে বেদান্ত, দর্শন শিক্ষা দেবার জন্যে রামমোহন উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে একে একে তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। একবার কোম্পানী ভারতবর্ষে শিক্ষার উন্নতির জন্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। কিন্তু গণ্ডগোল বেধে গেল এই টাকা কিসের খাতে ব্যয় করা হবে। সমস্ত প্রাচীন পন্থীদের মত হ'ল সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে এই টাকা ব্যয় করা হোক, আর রামমোহন বললেন যে ও টাকা ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের জন্যে ব্যয় করা হোক। এই ব্যাপারে রামমোহন তখন কার গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট কে এক দীর্ঘ পত্র লিখলেন; কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, আর বেশী দিন ভারতকে অন্ধকারের মধ্যে ফেলে রাখা যায় না।

এই ঐতিহাসিক পত্রের ফল স্বরূপ বার বছরের মধ্যে দেশের প্রায় সমস্ত জায়গায় ইংরাজী শিক্ষার দারুণ প্রচলন হয়। একটি মাত্র কাজের জন্যে রামমোহন শিক্ষা সংস্কারক হিসাবে আজও অমর।

॥ নয় ॥

এবার রামমোহনের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ভারতে তখন সংবাদ পত্রের প্রচলন হয়েছে।

রামমোহন যেমন রাজনীতিজ্ঞ তেমনি আইনজ্ঞ। দেশের অবস্থা তিনি ভাল করে বুঝতে পারছেন।

অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানী সরকারের আচরণ খারাপ দেখে তিনি কাগজে সরকারী আচরণের নিন্দে শুরু ক'রে দিলেন।

তখন দেশে 'সম্বাদ কৌমুদী' সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেই সংবাদ পত্রে রামমোহন তীব্র ভাষায় সরকারী নীতির সমালোচনা করলেন। বিভিন্ন যুক্তি তর্ক দিয়ে সরকারের কাছে দাবী জানালেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল যে, জমিদারদের সঙ্গে সরকারের যেমন একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তেমনি প্রজাদের সঙ্গে জমিদারদের একটা বন্দোবস্ত থাকা উচিত।

সেই সময় একটু বেশী শিক্ষিতদের জন্যে 'মিরাৎ উল আখবার' প্রকাশ করলেন রামমোহন।

সেই সংবাদ পত্রে মন্তব্য করলেন যে হাইকোর্টে দেশীয় প্রজাদের জুরী হবার অধিকার দিতে হবে। কিছুদিন পর দেশীয় প্রজারা জুরী হবার অধিকার পেল। ঐ পত্রিকায় বিশেষ ভাবে জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় রাজনীতি সম্বন্ধেই বেশী প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল। ব্রিটিশ জাতির ঔদ্ধত্যের কথা তিনি সংবাদ পত্রে লিখতে ভুললেন না।

আরও লিখলেন যে, পার্লামেণ্টে আইন তৈরী করার সময় জনগণের প্রতিনিধি থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেকটি আইন তৈরী করার আগে জনগণের মতামত নেওয়া একান্ত অপরিহার্য, একথা সরকার যেন গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখেন।

১৮২৩ সালে 'ক্যালকাটা-জার্নাল' নামে একটি ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশিত হ'ল। এর সম্পাদক ছিলেন মিঃ বাকিংহাম। তিনি নির্ভিক সম্পাদক ছিলেন। সরকারী কাজের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখলেই তিনি তাঁর কাগজে সমালোচনা করতে শুরু করতেন। এর জন্যে সরকার মিঃ বাকিংহামকে কয়েকবার সাবধান করেছিলেন। কিন্তু বাকিংহামের লেখনী থেমে রইল না; তখন তাঁকে ও তাঁর সহ সম্পাদককে দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্যে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল।

রামমোহনের 'মিরাৎ' পত্রিকাও তাই। বাকিংহামের প্রতি সরকারের এমন জঘন্ন নির্বিচারের ফলে তিনি 'মিরাৎ' পত্রিকায় সমালোচনা লিখলেন।

তখন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণর জেনারল জন এ্যাডাম। তিনি সংবাদ পত্রের ব্যাপারে একটি আদেশ প্রচার করলেন। নোতুন আদেশে বলা হ'ল যে, যদি কোন ব্যক্তি সংবাদ পত্র প্রকাশ করতে চায় তবে প্রধান সেক্রেটারির স্বাক্ষরিত সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারলের অনুমতির দরকার হবে।

রামমোহন দেখলেন আদেশটিতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে।

এ্যাডামের এ আদেশ যাতে আইনে পরিণত না হতে পারে তার জন্যে তিনি সুপ্রীম কোর্টের কাছে আবেদন পত্র পাঠালেন। তাতে সই করলেন রামমোহন রায়, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরী চরণ বন্দোপাধ্যায় ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

কিন্তু সে আবেদন অগ্রাহ্য হ'ল। রামমোহন কাগজ বন্ধ করে দিলেন।

'মিরাৎ' বন্ধ হ'য়ে গেল।

রামমোহন তখন বহু পত্রিকায় 'য়্যান অবজার্ভার', এ ফ্রেণ্ড টু রিফর্ম' প্রভৃতি ছদ্মনামে বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করতে লাগলেন। রাষ্ট্র-

শাসন ব্যাপারে সরকারী দুর্নীতির সমালোচনা, তাছাড়া ধর্ম্ম ও সংস্কার নিয়ে আন্দোলন ব্যাপারে দেশের লোকের প্রতি আহ্বান বাণী তিনি ঐ সমস্ত কাগজে লিখলেন।

রামমোহনের কর্ম্মজীবনে অবসর বলতে কিছু ছিল না। ঘুমন্ত দেশবাসীর শিয়রে অতন্দ্র প্রহরীর মত তিনি সব সময় বসে থাকতেন।

তিনি দেখলেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধীরে ধীরে ভারতের ওপর শাসন ও শোষন যন্ত্র কায়েম করে চলেছে। দেশের লোক সরকারী অত্যাচার অবিচার চোখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছে। নানা দিক দিয়ে দেশবাসী অত্যন্ত দুর্বল। অর্থনৈতিক দুরবস্থা, রাজনৈতিক সচেতনাতার অভাব। সরকারের খেয়াল খুসী মত দেশে আইন জারি ইত্যাদি জন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

রামমোহন বিলেত যাবার মনস্থ করেন। কিন্তু কি করে তিনি যাবেন। অথচ বিলেত যাবার তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। তাঁর ইচ্ছা বিলেতে গিয়ে ভারতীয়দের দুরবস্থার কথা ইংলেণ্ডের লোকের কাছে জানাবেন।

তিনি ভেবেছিলেন যে, যদি ইংলণ্ডের লোকের কানে এ কথা যায় তবে নিশ্চয়ই এর একটা প্রতিবিধান হ'তে পারে। কেন যে এমন ধারণা পোষণ করেছিলেন তিনিই জানেন।

যাইহোক বিলেতে যাবার নানা সুযোগ খুঁজতে লাগলেন তিনি।

বিলেতে যাবার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—সেখানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি তিনি স্বচক্ষে দেখে আসবেন। তাদের জীবন যাত্রা প্রণালী, শিক্ষা দীক্ষা ও রাজনীতি জ্ঞানের ব্যাপারে তাঁকে একটা সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করতে হবে।

কিছুদিন চেষ্টা করার পর বিলেতে যাবার সুযোগ এসে গেল।

তৎকালীন মোঘল সম্রাট তৃতীয় আকবরের সঙ্গে কোম্পানীর কয়েকটা বিষয়ে গোলমাল চলছিল। তারই নিষ্পত্তির জন্য সম্রাট একজন উপযুক্ত লোককে বিলেতে পাঠাবার জন্য চিন্তা করছিলেন।

সম্রাট রামমোহনের সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনে ছিলেন। প্রতিটি বিষয়ে অভূত জ্ঞান সঞ্চয়ের কথা সম্রাট শুনেছিলেন। সম্রাট যখন শুনলেন যে, রামমোহন বিলেতে যাবার জন্যে বহুদিন ধরে চেষ্টা করছে তখন সম্রাট রামমোহনকেই উপযুক্ত লোক ভেবে বিলেতে পাঠাবার মনস্থ করলেন।

সম্রাট রামমোহনকে দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমন্ত্রন জানালেন।

রামমোহন যথা সময়ে উপস্থিত হলেন। সম্রাট বললেন,—"আপনাকে আমার প্রতিনিধি হ'য়ে বিলেতে যেতে হবে বিশেষ একটি কাজের জন্যে।"

রামমোহন এই সুযোগই খুঁজছিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজি হ'য়ে গেলেন সম্রাটের প্রস্তাবে।

সম্রাট তাঁকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করলেন।

সম্রাট পাঠালেন তাঁর যোগ্য প্রতিনিধিকে।

আর একটি চিন্তার জগৎ রামমোহনের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। বন্ধদ্বার খুলে দেবার যে সুযোগ তিনি পেলেন তা দিয়ে তিনি স্বাধীনতার বীজ রোপন করবেন ভারতবাসীর অন্তরে।

বন্ধু-বান্ধবেরা সেদিন রামমোহনের বিদেশ যাত্রার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করলেন। শুভাকাঙ্খীরা রামমোহনের যাত্রা পথের শুভ কামনা করলেন।

## ॥ দশ ॥

রামমোহনের বিলেত যাবার চারটি কারণ ছিল।

প্রথমতঃ ইউরোপের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ।

দ্বিতীয়তঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ এবং নোতুন শাসন সংস্কার।

তৃতীয়তঃ সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে ধর্ম্মসভায় আপীল।

চতুর্থতঃ পার্লামেণ্টে দিল্লীর মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের আবেদনের তদারক।

এর মধ্যে প্রধান কারণটি হ'ল কোম্পানীর সম্বন্ধ।

আঠার শ' তিরিশ সাল, পনেরই নভেম্বর।

আলবিয়ন জাহাজে চড়ে রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করলেন।

সাতসমুদ্র তের নদী পেরিয়ে ইংলণ্ড যেতে হয়। তখনকার দিনে সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশ গেলে নিন্দার ব্যাপারই হ'ত।

সকলেরই এমনি একটা ধারণা ছিল যে বিদেশে গেলে জাত খোয়া যায়। সেইজন্যে কাউকে সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশ যেতে দেওয়া হ'ত না, বা কেউ যেতেও চাইত না।

তখন সমুদ্রের জলকে কালাপানি বলা হ'ত।

এই কালাপানি সকল ভারতবাসীর কাছে একটা ভীতির কাবণ ছিল।

কারণ সবাই ভাবত বিদেশে গিয়ে প্রত্যেককেই বিদেশীয়দের হাতের রান্না-বান্না খেতে হয় অতএব ভিন্নধর্ম্মের লোকের হাতে জল খাওয়া এটা ধর্ম্ম বিরোধী কাজ। তাহলে জাতটি আর রইল কোথায়।

রামমোহন তো ঐ সমস্ত কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি কারও কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি চললেন ইংলণ্ড।

সেদিনটি ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

তখন বাষ্পচালিত জাহাজ তৈরী হয়নি। পাল তোলা জাহাজ।

অতএব এই পাল তোলা জাহাজে যেতে প্রায় পাঁচ ছয় মাস সময় লাগত।

এতদিন ধরে সমুদ্রের ওপর জাহাজে কাটান কি যে দুষ্কর ছিল তা একমাত্র ভুক্ত ভোগীরা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না।

'সমুদ্র-পীড়া' অর্থাৎ সী সিফ্‌নেশ নামে এক রকম পীড়ায় সকলেই জর্জরিত হ'য়ে পড়ত।

রামমোহন দেখলেন জাহাজের প্রায় প্রত্যেকটি লোক ঐ রোগে আক্রান্ত। ছেলে, যুবা, স্ত্রী, প্রৌঢ় প্রত্যেকেই রোগের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করছে।

রামমোহন ওদের কথা ভাববেন কখন। তাঁর মনে একটি মাত্র চিন্তা 'রিফরম্‌ বিল' অর্থাৎ 'সংস্কার বিল'।

একটি মাত্র চিন্তা রামমোহনকে সমস্ত ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছে।

যাত্রীদের অনেকে এসে জিজ্ঞেস করলেন,—"মশাই, আপনার গা ওলোচ্ছে না?"

রামমোহন উত্তর দিলেন,—"আপনাদের মত আমার শরীর নয়। একটুতে আমার কিছু হয় না।"

রামমোহনের কথা শুনে যাত্রীরা হতভম্ব হ'য়ে গেল। এতদিন ধরে জাহাজে থাকা সোজা কথা নয়, আর বলে কিনা একটুতে কিছু হয় না।

রামমোহনের দিকে তারা সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তারা নিরীক্ষণ করতে লাগল তাঁর।

রামমোহন জিজ্ঞেস করলেন,—"কি দেখছেন?"

যাত্রীরা বলল,—"আপনার শরীর।"

রামমোহন বললেন,—"এ শরীর প্রতিদিন মুগুর ভেঁজে গঠিত হয়েছে।"

তিনি বললেন যে জীবনে তিনি প্রচুর মাংস খেয়েছেন। যাত্রীরা রামমোহনের শরীরের তারিফ না ক'রে পারল না।

হঠাৎ রামমোহন একদিন জাহাজের ডেকে পড়ে গেলেন। পায়ে চোট লেগে তিনি বেশ জখম হলেন।

তাঁকে শয্যা নিতে হ'ল সেদিন থেকে।

শুয়ে শুয়ে অজানা অদেখা ইংলণ্ড সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন।

স্পষ্ট চোখের সামনে কল্পিত ইংল্যাণ্ড ভেসে উঠছে। যেখানে রাজনীতি, সামাজিক জীবন, শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান সম্বন্ধে কত রকম যে তিনি ভাবতে লাগলেন তার ইয়ত্বা নাই।

পরের দিন জাহাজের মধ্যে একটা গুঞ্জন ধ্বনী শোনা গেল।

তিনি শুয়ে শুয়ে শুন্‌লেন যে স্বাধীন ফরাসীরা তিনরঙ্গা পতাকা উড়িয়ে মহা আনন্দে চলেছে সমুদ্রের বুকে।

খবরটা কানে আসতেই তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন।

আনন্দে তাঁর সারা শরীর কাঁপছে! ফরাসী দেশ স্বাধীন হয়েছে রামমোহনের মনে আনন্দের জোয়ার।

কাগজে পরাধীন ফরাসীবাসীর দুঃখ দুর্দশার কথা মনে পড়ে তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছিল। তাদের দুঃখকে ভারতবাসীর দুঃখের ন্যায় মনে করে বিমর্ষ হ'য়ে পড়তেন।

তাই আজ খবরটা তাকে একটা নোতুন পথের সন্ধান দিল।

রামমোহন ফরাসী জাহাজকে থামালেন। হাতের কাছে পাওয়া জিনিষ হাত ছাড়া করলেন না। তাছাড়া পরে ফরাসী দেশ বা সেখানের মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে কিনা আদৌ জানা নেই।

সেইজন্যে রামমোহন ফরাসী জাহাজ থামিয়ে ওদের জাহাজে উঠে গেলেন।

বিপ্লব ও মুক্তি আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত ভলতেয়ার ভক্ত রামমোহন ফ্রান্সের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকে আন্তরিক ভাবে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালেন।

কথিত আছে রামমোহন এতই সেদিন উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলেন যে সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে গিয়ে পড়ে গিয়ে তিনি অবশিষ্ঠ জীবন খঞ্জ হ'য়ে কাটাল।

ফিরে এলেন নিজের জাহাজে।

শুয়ে শুয়ে ভারতের কথা ভাবছেন। তিনি আরও ভাবনায় পড়ে গেলেন।

কবে আসবে সেইদিন, যেদিন ভারত সাম্য মৈত্রীর বাণী নিয়ে বুক ফুলিয়ে দেশের স্বাধীনতার জয়লাভের ঘোষণা করবে। মানুষরা কি করে তাদের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী লাভ করে মানুষের মত বেঁচে থাকবে।

রামমোহন সেই অনাগত দিনটিকে পুষ্পার্ঘ দিয়ে সস্নেহে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন মনে মনে।

ক্রমাগত পাঁচমাস জাহাজ চলল সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে।

অবশেষে একদিন জাহাজ এসে ভিড়ল লিভারপুল বন্দরে। সেদিনটা ছিল আঠার শ' একত্রিশ সালের আটই এপ্রিল। ঐ দিনটি থেকে রামমোহনের জীবনে এক নোতুন অধ্যায় শুরু হ'ল।

বন্দর থেকে হোটেলে উঠলেন রামমোহন।

তখন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে সংস্কার আইন নিয়ে তুমুল গণ্ডগোল শুরু হয়েছে।

জনগণ চীৎকার করে বলছে পার্লামেণ্টে তাদের অধিকার চাই! এটা মানুষের জন্মগত অধিকার।

রামমোহনের মনকে আন্দোলিত করল জনগণের এই রাজার বিরুদ্ধে জেহাদ শুনে। তিনি লণ্ডনে চলে গেলেন।

সেইদিন তাঁর কণ্ঠও যোগ দিল ওখানের জনগণের সুরে সুর মিলিয়ে।

প্রকাশ্য সভায় ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন রামমোহন। যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনে সারা ইংলণ্ডের লোক তাঁকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। সারা ইংলণ্ডে তাঁকে চিন্‌তে আর বাকী রইল না।

রামমোহনকে লণ্ডনে অভ্যর্থনা সভায় লণ্ডনের লোক যেরূপ সম্মান দেখিয়েছিল, খুব কম লোকের ভাগ্যে এমন ঘটে।

পরাধীন ভারতের একটি মানুষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ইংলণ্ডে গিয়ে প্রকাশ্য সভায় যে সমাদর ও শ্রদ্ধা লাভ করলেন – এ দৃশ্য কল্পনাতীত।

কিছুদিন পর সংস্কার আইনটি বিধিবদ্ধ হ'য়ে গেল।

রামমোহনের প্রাণে নোতুন বল এল। নোতুন শক্তি এল। সেদিন জনগণের অধিকারকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালেন তিনি।

তিনি প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

সভায় সভায় তিনি ভারতবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা গভীর বেদনার সঙ্গে লোক সমক্ষে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

সাধারণ চাষাদের কথা, গরীব দুঃখীদের কথা, সাধারণ প্রজাদের প্রতি জমিদারদের অবাধ অত্যাচারের কাহিনী কোন জিনিষই বাদ দিলেন না—বলতে। ভারতীয়গণ যাতে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে সরকারের অধীনে উচ্চপদ লাভ করতে পারে সেই বিষয়ে তিনি অজস্র বক্তৃতা রাখলেন জনগণের সামনে।

একদিন পার্লামেণ্টে রামমোহনের ডাক পড়ল। রামমোহন তখন শয্যাশায়ী। হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় তিনি পার্লামেণ্টে যোগদান করতে পারলেন না। পার্লামেণ্টে তিনি একটি চিঠি লিখে পাঠালেন। "যদি ব্রিটিশ সরকার ভারতে রাজ্য চালাতে চায় তবে মানুষের সমস্তজেন্মগত অধিকারগুলোকে মানুষের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

ভারতে ফার্সী আরবী ভাষা তুলে দিয়ে ইংরাজী ভাষায় সরকারী কাজকর্ম্ম চালাতে হবে। সেইজন্যে দেশে উপযুক্ত ইংরাজী শিক্ষা চালু করে দেশের লোককে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। গরীব চাষীদের জমির খাজনা তুলে দিতে হবে। সৈন্য বিভাগে দেশের লোক নিয়োগ করতে হবে। আইন বিভাগে আইন তৈরী করার সময় দেশের লোকের

মতামত নিতে হবে এবং তাদের সরাসরি ভাবে আইন প্রণয়নের জন্যে অংশ গ্রহণ করতে দিতে হবে।"

পার্লামেণ্ট রামমোহনের কিছু কিছু পরামর্শ মেনে নিলেন। ইংরাজীতে আপিস আদালতের কাজকর্ম্ম চলতে শুরু করল।

যে পার্লামেণ্ট একদিন সম্রাটের দৌত্যকে স্বীকার করে নি, রামমোহনের বজ্ররূপী লেখনী সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দিল।

রামমোহন সম্রাটের সঙ্গে দেখা করলেন।

রামমোহনের পাণ্ডিত্য ও যুক্তিপূর্ণ পরামর্শদানের কথা চিন্তা করে সম্রাট এতই প্রীতি হলেন যে দিল্লীর বাদসাহেব দেওয়া 'রাজা' উপাধিকে তিনি হৃষ্ট চিত্তে মেনে নিলেন।

রামমোহন রিজেণ্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বাস করতেন।

বেশী দিন ঐ বাড়ীতে তিনি রইলেন না। কারণ প্রাসাদ তুল্য বাড়ীতে থাকতে গেলে অনেক খরচ বেড়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া এত জাঁকজমকের মধ্যে থাকতে তিনি পছন্দ করতেন না। সেইজন্য তিনি ঐ বাড়ী ত্যাগ করে বেডফোর্ড স্কোয়ারে ডেভিড হেয়ারের সহোদরদের বাড়ীতে উঠে গেলেন। যতদিন তিনি লণ্ডনে ছিলেন ঐ বাড়ীতেই তিনি থাকতেন।

কোলকাতা থেকে ডেভিড হেয়ারতাঁর ভাইদের চিঠি লিখে জানিয়ে ছিলেন যে রামমোহন তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু, অতএব তাঁকে যেন অধিক যত্ন সহকারে তাঁদের নিজেদের বাড়ীতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

হেয়ারের ভাইয়েরা রামমোহনের জন্য তাঁদের বেডফোর্ড স্কোয়ারের বাড়ীতে অত্যাধিক যত্ন সহকারে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

একটি ঘোড়ার গাড়ী, একজন সহিসের ব্যবস্থা করে দিলেন। রামমোহন ইচ্ছামত সেই ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে এখান সেখান যাতায়াত করতেন। কোন কাজে রামমোহন ফরাসী দেশে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

ডেভিড হেয়ারের ভাই তাঁর সঙ্গী হ'ল। এ সময়টা হচ্ছে আঠারশ বত্রিশ খৃষ্টাব্দ।

তখন ফ্রান্সের সম্রাট লুই ফিলিপ। রামমোহনের প্রকৃত পরিচয় লাভ করে সম্রাট সন্তুষ্ট হলেন।

তিনি ভোজসভায় রামমোহনকে নিমন্ত্রণ জানালেন। একত্রে বসে আহার করলেন তাঁরা।

একই হোটেলে সুপ্রসিদ্ধ কবি টমাস্ মুরের সঙ্গে একত্রে বসে আহার করেন রামমোহন।

রামমোহন ফ্রান্সে চার মাস রইলেন।

তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। সময়টি হচ্ছে আঠার শ' তেত্রিশ খৃষ্টাব্দ।

পুনরায় তিনি কর্ত্তব্য কার্যে মন দিলেন।

ভারতে ব্রিটিশশাসন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারই রামমোহন চেয়েছিলেন। সে সম্বন্ধে তিনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা অতি মূল্যবান।

তাঁর দাবী ছিল—এদেশবাসী ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর যেন আইন তৈরী করবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা না থাকে। ভারতবর্ষ যেন উদ্ধত রাজকর্ম্মচারীর দুর্ব্যবহারে লাঞ্ছিত না হয়। ইংলণ্ডে থাকা কালীন রামমোহনের সঙ্গে সমাজতন্ত্র বাদের জনক রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। ওয়েন তাঁকে সোশালিজমের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

রামমোহন সোশালিজম গ্রহণ করতে পারেননি; তবে তিনি ওয়েনের কার্যসূচীকে সমর্থন করতেন।

এই প্রসঙ্গে রবার্ট ওয়েনের পুত্র রবার্ট ডেল্ ওয়েনকে রামমোহন একটি পত্র দিয়েছিলেন। পত্রটি পড়লে বোঝা যাবে যে তিনি সত্যই সোশালিজমের কার্যসূচীকে সমর্থন করেছিলেন কি না।

নীচে রামমোহনের লিখিত পত্রটি দেওয়া হ'ল।

৪৮, বেডফোর্ড স্কোয়ার

এপ্রিল ১৯, ১৮৩৩।

প্রিয় মহাশয়,

গতকল্য আপনার বাড়ীতে আপনার অথবা আপনার কোন বন্ধুর সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য না হওয়ায় আমি মঙ্গলবার রাত্রে আপনার নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম তৎসম্পর্কে লিখিতভাবে দুই একটি মন্তব্য করিবার ইচ্ছা অনুভব করিতেছি এবং আমার মনে হয় আপনি উহাতে একমত হইবেন। উহা এইরূপ— ইংলণ্ডে অথবা আমেরিকায় উহাদের জনসাধারণের সামাজিক, পারিবারিক এবং রাজনৈতিক কল্যাণসাধনের জন্য ধর্ম্মের, বিশেষভাবে যে ধর্ম্ম পদ্ধতি বিশ্বপ্রেম এবং উদারতা শিক্ষা দেয় তাহার বিরোধিতা করিবার প্রয়োজন নাই। লক এবং নিউটনের ন্যায় কল্যাণব্রতীরা কি ধর্ম্মের বিরোধিতা করিয়াছিলেন? না! বরং ধর্ম্মে যে সমুদয় ব্যভিচার ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়াছে তাহা দূর করিতেই তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন। মুহুর্ত্তের জন্য যদিও স্বীকার করা যায় যে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক সত্য সমূহ স্বাধীন চিন্তাবিদের নিকট সন্তোষজনক ভাবে প্রমান করা যায় না, তথাপি নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের ফলে আমার ধারণা এই যে আমরা প্রেম ও উদারতা সম্পন্ন ধর্ম্মপদ্ধতি (খ্রীষ্টধর্ম্ম) আমাদের সুখবর্দ্ধনে, পারস্পাশিক আদান-প্রদানের অধিকতর সুযোগদানে এবং আমাদের অশালীন কামনা ও মনোবৃত্তি দমনে সক্ষম বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। আমি ইহা দেখিয়া দুঃখীত হইতেছি যে আপনার অতি উদার পিতা ধর্ম্মের বিরোধিতা দ্বারা তাঁর নিজেরই সাফল্যে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি উপরোক্ত অর্থে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অনুগামী। হ্যামিলটনের ইষ্ট ইণ্ডিজ গ্রন্থ (প্রথম খণ্ড) আপনাকে পাঠাইবার অনুমতি দান করুণ উহার ৩৫ পৃষ্টার ৩১ লাইনে দেখিবেন আপনার পিতা বর্ত্তমানে যে মতবাদ উপস্থিত করিতেছেন দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভারতের ব্রাহ্মণেরা প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করিয়া গিয়াছেন এবং ঐ মত কোন ক্রমেই ধর্ম্ম বর্জ্জিত ছিল না। আপনার এবং আপনার পিতার উদার কার্যকলাপের সাফল্যে

আমি দেখিতে চাই বলিয়াই আমি এই মন্তব্যসমূহ করিতে সাহসী হইয়াছি ; আমি আশা করি আমার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া আপনারা আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত

রামমোহন রায়।

পুনশ্চ ঃ—আমি ইনফ্লুয়েঞ্জার দারুণ আক্রমণে কষ্ট পাইতেছি, কয়েক মিনিট বসিতে বা কয়েক লাইন লিখিতেও বাধা পাইতেছি —।

রামমোহন ইংলণ্ডের প্রচলিত একটি কুসংস্কারকে দূর করলেন।

সেটি হচ্ছে তখনকার দিনে খৃষ্টানরা বিশ্বাস করত যে মানুষ পাপ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে।

রামমোহন এ ধারণাকে মোটেই মনে স্থান দিলেন না।

তিনি ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করার জন্যে বিভিন্ন সভায় যুক্তি-তর্ক খাড়া করে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন।

তিনি মানুষদের বুঝিয়ে দিলেন যে এটা মানুষের অন্ধ ধারণা এর কোন ভিত্তি নাই। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে এ কথা লেখা নাই।

ইংরাজরা রামমোহনের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে বিশ্বাস করল যে সত্যই এটা একটা কুসংস্কার। সকলেই তখন রামমোহনের ভক্ত হ'য়ে উঠল।

রামমোহনের অকাট্য যুক্তির বলে বহুদিনের প্রচলিত কুসংস্কারটির মূলোচ্ছেদ হ'ল বলে সেখানের বহু ধর্ম্মযাজক রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

রামমোহনের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করে তাঁরা সন্তুষ্ট হলেন। অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হ'ল।

বন্ধুদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী অনুরাগী বন্ধু হলেন রেভারেণ্ড ডেভিডসন্ নামে এক বিশিষ্ট ধর্ম্মযাজক। তিনি রামমোহনকে এতই শ্রদ্ধা করতেন যে তাঁর একটি পুত্রের নাম রেখেছিলেন রামমোহন। সেই ছেলেটিকে রামমোহন অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

## ॥ এগার ॥

লণ্ডনের কাজ এক রকম শেষ।

রামমোহনের পালিত পুত্র রাজাবামকে তিনি ব্রিষ্টলে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবাবের মধ্যে বেখে এসেছিলেন তার শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্যে।

তাই বামমোহন ব্রিষ্টলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। লণ্ডনেব কোলাহল ও ব্যস্ততার চেয়ে ব্রিষ্টলের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত। সেইজন্যে আঠার বছরের একটানা পরিশ্রমে বামমোহনেব শবীরকে তুর্বল করে দিয়েছিল। তাছাড়া ক্যাসেল পরিবাবের কুমারী ক্যাসল ও ডাক্তার কারপেন্টারের অনুরোধে রামমোহন ব্রিষ্টলে গেলেন।

বিষ্টলে রামমোহনের জন্যে একটি সুন্দর বাড়ী ঠিক করে রেখেছিলেন ডাক্তার কারপেন্টার। এটাই ছিল কুমারী ক্যাসেলের 'ষ্টেপলটন গ্রোভ।'

সঙ্গে এলেন হেয়াবের বোন। তিনি পরম আত্মীয়ের মত রামমোহনকে নিস্বার্থ সেবা কবলেন।

সেখানে রামমোহনকে সঙ্গে বহু গরীব, সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, ধর্ম্মযাজকদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল।

সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি, অর্থনৈতিক প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা করে তাদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন রামমোহন।

একদিন 'ষ্টেপলটন গ্রোভে' বহু লোক নিমন্ত্রিত হ'য়ে এলেন রামমোহনের বক্তৃতা শোনার জন্যে।

তিনি তিন ঘণ্টা যাবৎ বক্তৃতা করলেন। যাবতীয় ব্যাপারে সুন্দর প্রাজ্জল ভাষায় বক্তৃতা শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। রামমোহনের প্রতি সকলের মস্তক অবনত হ'ল গভীর শ্রদ্ধায়। দিনটা ছিল সতেরই সেপ্টেম্বর আঠার শ' তেত্রিশ খৃষ্টাব্দ।

কে জানত যে রামমোহনের জীবনে এই শেষ বক্তৃতা। কে জানত যে ভারত সূর্যের তেজপূর্ণ রশ্মিসৃষ্টা এত সহজে পৃথিবী থেকে বিলীন হ'য়ে যাবে।

হায় ভাগ্য ? কি নিষ্ঠুর পৃথিবী।

হঠাৎ অঘটন ঘটল।

আঠারই সেপ্টেম্বর। রামমোহন অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। শরীরে জ্বর অনুভত করলেন। দেহ ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হ'য়ে আসছে।

বন্ধুরা রামমোহনকে বিশ্রাম নিতে বললেন। ডাক্তার কারপেন্টার রামমোহনকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানালেন তিনি যেন বিছানা ছেড়ে না ওঠেন।

রামমোহনের চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার ক্যারিককে আনা হ'ল। ডাক্তার ভালভাবে পরীক্ষা করলেন তার সমস্ত শরীর। তিনি বুঝতে পারলেন যে রামমোহনের 'ব্রেন ফিভার' হয়েছে।

মানসিক দুশ্চিন্তাই এর একমাত্র কারণ। মানসিক দুশ্চিন্তা এসেছে অর্থনৈতিক উদ্বেগের ফলে।

দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহ রামমোহনকে বিলেত যাবার জন্যে যে পরিমাণ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেননি।

তাছাড়া কোলকাতা থেকে যে সমস্ত বন্ধুদের নিয়মিত টাকা পাঠাবার কথা ছিল, তা তারা পাঠায়নি।

এই সব নানা কারণে রামমোহনের মানসিক দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার ক্যারিক রামমোহনের ব্রনকে সুস্থ করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন।

আজকের দিনে যাকে ব্লাড্‌প্রেসার বলা হয় রামমোহনের তাই হয়েছে। একেবারে হাই ব্লাড্‌প্রেসার

ডাক্তারের চেষ্টা বৃথা হ'ল।

ধনুষ্টঙ্কারের প্রত্যেকটি লক্ষণ দেখা গেল রামমোহনের শরীরে। ডাক্তার উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু সব চেষ্টা বৃথা হ'ল। ভগবান যাকে নিজের কাছে টান্‌ছেন, তাকে কি মানুষ ধরে রাখতে পারে?

রামমোহনকে তাই তার বন্ধুরা কেউই ধরে রাখতে পারলেন না এ পৃথিবীতে।

আঠার শ' তেত্রিশ খৃষ্টাব্দের সাতাশে সেপ্টেম্বর; শুক্রবার রামমোহনের মৃত্যু হ'ল ব্রিষ্টল শহরে।

অপূর্ব চরিত্রের অপূর্ব মৃত্যু!

কুমারী ক্যাশেস ও হেয়ারের বোন রামমোহনের শিয়রে বসে মায়ের ন্যায় সেবা যত্ন করে তাঁর জীবন ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলেন বলে তারা অশ্রুকে সংবরণ করতে পারলেন না। শোকে মূহ্যমানা দুটি হৃদয় এক কঠিন আঘাতে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল। রাত্রি দুটো বেজে পঁচিশ মিনিটের সময় প্রবাসী রাজার সবল দেহের পরিণতি ঘটল। ব্রিষ্টলের আকাশ বাতাস হাহাকার করে উঠল এক বিদেশী বন্ধুর অভাবনীয় মৃত্যুতে।

ব্রিষ্টলের মাটি রামমোহনের দেহ ধারণ করে পূণ্য হ'ল।

পরিণত হ'ল তীর্থভূমিতে।

রাজার মৃত্যু দৃশ্য মিস্‌ কলেট মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা কবেছেন :- -

'এইভাবে সেই মহান হিন্দুর আত্মা চলিয়া গেল। বাল্যে পৈত্রিক ধর্ম্ম ও পিতৃ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, যৌবনে বিপুল সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া তিনি যে সব পরিবর্ত্তনেব ভিতর দিয়া জীবন যাপন কবিতেছিলেন, আজ তাহা চরম পরিবর্ত্তনে পরিণত হ'ল। বিশ্রামহীন সাহসী সত্যান্বেসী আজ শান্তিময় গম্যস্থানে পৌছিলেন। এই মহাপ্রস্থানের মধুর, কবিত্বপূর্ণ করুণ দৃশ্য ভারতবাসীর কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ে ও স্মৃতিতে সুদীর্ঘকালস্থায়ী থাকিবে। বাহিরে সেই আশ্চর্য সুদূর প্রতীচ্য দেশ, শারদীয় চন্দ্রমার স্নিগ্ধ আলোকে নিদ্রিত, দীপ্ত মনোরম পল্লীদৃশ্য, রজতশুভ্র চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত নিভৃত উদ্যানগৃহ, সমস্তই শান্ত ও নিথর;

প্রকৃতি ও রাত্রি উভয়ে মিলিয়া যেন অনন্ত নিস্তব্ধতাই ইঙ্গিত করিতেছিল। ভিতরে সেই মহান মুক্তিদাতা মৃত্যুর শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, আর প্রহেলিকাময় যে স্বাধীনতা ও শান্তির আশা ও প্রতীক্ষায় জীবন পর্যন্ত অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাই লাভ করিতেছিলেন। ভবিষ্যতে জ্ঞানদীপ্ত মুক্ত প্রাচ্য দেশবাসী রামমোহনের ধর্ম্মবিশ্বাসী অসংখ্য বংশধবগণের পক্ষে এই করুণ ও অদ্ভুত দৃশ্য একটি পবিত্র স্মৃতিস্বরূপ বর্ত্তমান থাকিবে।'

বাজাব মৃত্যু সময়ে শুধু ধ্বনিত হয়েছিল রাজার প্রাণের ভাষা—"ওঁ"। জীবনে ভগবৎ চিন্তায় তাঁর অধিকাংশ সময় কেটে গিয়েছিল তাই তিনি ঈশ্ববের অপার করুণা লাভ করেছিলেন।

রামমোহন ছিলেন সারা পৃথিবীব নাগবিক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে আশ্চর্য সংমিশ্রণে িনি এনেছিলেন নোতুন প্রাণ নোতুন আদর্শ।

পৃথিবীব প্রত্যেক মানুষের আত্মাকে নিজের সঙ্গে একান্ত করে দিয়েছিলেন। ভারতের সনাতন আদর্শবাদকে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে দেশেব আসনকে উচ্চে স্থাপন করেছিলেন। অন্যদিকে বিদেশের শিক্ষাদীক্ষাকে নিজের অন্তরে স্থান দিয়ে দুটি দেশের মূল মন্ত্রকে একই কণ্ঠে উচ্চাবণ করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁর মৃত্যুতে সারা পৃথিবীর বুকে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। সেইজন্যে তিনি ইউরোপের মাটিতে নিজের মৃত্যু শয্যা পাতলেন।

দিগ্বীজয়ী তর্কযোদ্ধা, স্বদেশ প্রেমিক ও স্বাধীনতার পূজারী রাজা রামমোহন ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর অক্ষয় অমর কীর্ত্তি নিয়ে তিনি আজ সকলের মাঝে বেঁচে আছেন।

দুটি মৃত্যুর বিনিময় আমরা কোনদিন ভুলতে পারব না। রামমোহন মৃত্যু বরণ করলেন ডেভিড হেয়ারের দেশে, বিনিময়ে হেয়াব সাহেব মৃত্যু বরণ করলে রামমোহনের দেশ ভারত বর্ষে।

দুজন দুজনের কীর্ত্তিকে পর দেশে বিলিয়ে দিলেন। দু জায়গায় দুটি তীর্থের জন্ম হ'ল।

মৃত্যুর পর রামমোহনের নশ্বরদেহ সমাধিস্থ করা হ'ল ষ্টেপলটন্ গ্রোভ নামে একটি নির্জন উদ্যানে।

রামমোহনের ভক্ত ও বন্ধু বান্ধবরা অনাড়ম্বরে তাঁর মৃতদেহকে নিয়ে গেলেন। সবাই শ্রদ্ধা জানাল এই আশ্চর্য সুন্দর বিদেশীর মৃত দেহের উদ্দেশ্যে।

কোলকাতায় এল রামমোহনের মৃত্যু সংবাদ। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বিষ্টলে গেলেন।

তিনি রামমোহনের নশ্বর দেহকে ষ্টেপলটন্ গ্রোভ থেকে তুলে এনে আরনোজডেল নামক একজায়গায় পুনরায় সমাধিস্থ করলেন। সমাধিস্থ করার সময় পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, রাজারাম, রামহরি, রামরত্ন ও কুমারী হেয়ার।

দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের সমাধির ওপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করার ব্যবস্থা করলেন। আজও সেই স্মৃতিস্তম্ভটি সযত্নে রক্ষিত হ'য়ে আছে।

ভারতবর্ষ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষটি নিজ কীর্ত্তির মধ্যে বেঁচে আছেন।

ব্রিষ্টলের পথচারীরা আজও সমাধির কাছে একবার থমকে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করে।

কোলকাতায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ওপর রামমোহনের প্রসাদতুল্য বাড়ীটির দিকে তাকালে সবার মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হ'য়ে আসে।

ভারত-ভাস্কর রামমোহনের জ্ঞানের পরিধি ছিল অসীম। ভাবতে বেশ বিস্ময় লাগে যে, যেদিন ভারতের প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি জীবজন্তু অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমর্জমান ছিল, সেই সময় কি করে ঐ মাটিতে দু'শো বছর ভবিষ্যতের ধ্যান ধারণা, জ্ঞান তপস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল একটি মানুষ। এটা সম্ভব হ'ল কি করে?

আমরা যে, যাকে তাকে জ্ঞানীগুনী বলে প্রচার করে বেড়াই রামমোহনকে ভালভাবে চিনলে আমাদের সে ভুল নিমেষে বিলীন হ'য়ে

যাবে । মনে মনে লজ্জা অনুভব করব আমরা। কি ধর্ম্ম, কি রাজনীতি প্রতেকটি বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের উৎকর্ষ গগনস্পর্শী।

রামমোহন সেদিন যদি জন্মগ্রহণ না করতেন। তবে ইংরজেরা ভারতবাসীর চোখে ধূলো দিয়ে সারা যুগের জন্মে কানা করে রাখত তাদের।

রামমোহন জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে ভারতবাসীকে পথ দেখিয়ে এনেছিলেন আলোর আঙ্গিনায়। ভারতের স্বাধীনতার মূল মন্ত্রটির বীজ বপন করেছিলেন তিনি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্মে সবটুকু কৃতিত্বের অধিকারী ভারত ভাস্কর রামমোহন।

রামমোহনের সম্বন্ধে কতটুকু বলতে পারলাম জানি না। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গেলে বোধহয় লেখনীকে কোন দিনই থামান যাবে না। যে ত্রুটি বিচ্যুতি র'য়ে গেল তা পাঠকরা নিজ গুনে ক্ষমা করবেন।

## ॥ বার ॥

রামমোহনের জীবনের কার্যকাল শেষ হ'ল।

এরপর রামমোহনকে নিয়ে যে সমস্ত মনীষীরা বিভিন্ন রচনা লিখে গেছেন তাঁদের রচনার সামান্য সামান্য অংশ তুলে ধরলাম পাঠকবর্গের সামনে।

কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--"আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভ কালেই এসেছেন রামমোহন। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ পষ্ট করে চিন্‌তে পারেনি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন এ যুগের যে আহবান, সে সুমহৎ ঐক্যের আহবান।"

"বিশ্ব মানবের একাত্মবোধ তাঁহার সমকালে জগতে আর কাহারো ভিতরে এমন পূর্ণভাবে দেখা যায় নাই। বর্তমান জগৎ সহযোগিতার জগৎ, স্বদেশের প্রাচীন অবিনশ্বর যাহা কিছু তাহা আয়ত্ত করিয়া অন্যান্য সাধনার প্রাতি রামমোহন হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন।"

"তিনি যখন আপন ভাষায় বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশের উপাদানকে বলিষ্ঠ করবার জন্য প্রবৃত্ত ছিলেন তখন বাংলা গদ্য ভাষার অনুদ্‌ঘাটিত পথ তাঁকে প্রায় প্রথম থেকেই কঠিন প্রয়সে খনন করতে হয়েছিল; যখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে বাঙ্গালীর মন উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি সেই অপরিণত গদ্যে দুরূহ অধ্যাবসায়ে এমন সকল পাঠকের কাছে বেদান্তের ভাষ্য করতে কুন্ঠিত হয়নি যাদের কোনো কোনো পণ্ডিতও উপনিষদকে কৃত্রিম বলে উপহাস করতে সাহস করেছেন ও মহানির্বানতন্ত্রকে মনে করেছিলেন রামমোহনেরই জাল করা শাস্ত্র।"

"এদেশে রামমোহন রায়ের যখন আবির্ভাব, তখন তো রীতিমত দুর্গতির দিন, মানুষের দৃষ্টিশক্তি ছিল মোহাবৃত, আর সৃষ্টি শক্তি ছিল আড়ষ্ট, বর্ত্তমান যুগের কোন প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতো বাণী তখন আমাদের ছিল না।"

মনীষী বিপিন চন্দ্র পাল রামমোহনের প্রতিভার একটি চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন—"ভারতবর্ষের সকল চিন্তানায়কগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতে আধুনিক চিন্তা ও জীবনের উৎস রাজা রামমোহন রায়। ভারতবর্ষের সর্বত্র তিনি আধুনিক যুগস্রষ্টা বলিয়া স্বীকৃত ও সম্পুজিত। কলিকাতা শহর হইতেই রামমোহন ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশে তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। মুঘল শাসনের সময়ে আমাদের মধ্যে যে সংস্কৃতিক সমন্বয় বিকাশ লাভ করিয়াছিল, রামমোহন ছিলেন তাহারই শেষ প্রতিনিধি। ভারত-মুসলিম সংস্কৃতির তিনি যেমন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ফল, তেমনি ইহার সহিত ভারত-য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রনের ফলে যে নব সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল, রামমোহন তাহারও অগ্রদূত ছিলেন। বর্ত্তমান কালের ভারতবাসী এই সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকারী।

রামমোহন একটি অভিনব বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন —তুলনামূলক ধর্ম। ইহারই ফলে পৃথিবীতে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুলির অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধ আজ সম্ভব হইয়াছে এবং ইহা বিশ্ব মানবতার পথও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক বিচার দ্বারা রামমোহন বিশ্ব মৈত্রীর বেদী রচনা করিয়া গিয়াছেন—পৃথিবীর সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে মিলিবার ও মিলাইবার পথও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং রামমোহন সমগ্র বিশ্বেরই মুক্তিদূত।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—"রামমোহনেরই প্রখর জ্ঞানাস্ত্রে কুসংস্কাররূপ অরণ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইল, তাহারই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রবিষ্ট হইল।"

"বাস্তবিক আমি এ পর্যন্ত যত লোক দেখিয়াছি; রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় সুমিষ্ট মেজাজের লোক দেখি নাই। তিনি বলবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁহার মাংসপেশী সকল শক্ত ছিল। রাজা আপনার শরীরকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন। শরীরকে

পরমেশ্বরের মূল্যবান দান বলিয়া মনে করিতেন। আমার পিতা রাজাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। সকল মহাপুরুষের ন্যায়, রাজা রামমোহন রায়ও স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ছিলেন।....আমি তাহার সম্মুখে বসিয়া তাহার সুন্দর মুখ দর্শন করিতাম। আমার হৃদয় এক প্রকার গভীর ও অবর্ণনীয় ভাবে পরিপ্লুত হইত। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রাজার সহিত আমার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল।"

"রামমোহন যে সময় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল ; পৌত্তলিকতার ব্যাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সামান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা ছিল ; অন্নশুদ্ধির উপরই বিশেষ ভাবে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয় কর্ম্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণ জাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন।.. তিনি যে সময় আবিভূত হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প হয়। তখন অন্ধকারের কাল। বঙ্গভূমি তিমিরাবৃত অরণ্য ভূমি রাক্ষসভূমি ছিল। ভ্রষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব করিত।"

ডিগ্‌বী সাহেব রামমোহনের সম্বন্ধে বলেছেন- "আমি যখন রামমোহনের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হইয়াছিলাম, তিনি তখন ইংরেজি ভাষায় কোনো প্রকারে কথাবার্তা বলিতে পারিতেন, শুদ্ধভাবে লিখিতে পারিতেন না। দেওয়ান নিযুক্ত হবার পর বিশেষ মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সহিত সরকারী চিঠি পত্রাদি পাঠ করিয়া ইংরেজদের সহিত আলাপাদি করিয়া এত সুন্দর সেই ভাষা শিখিয়াছিলেন যে শুদ্ধরূপে লিখিতে ও ভালরূপ বলিতে পারিতেন। তিনি সর্বদা ইংরেজি খবরের কাগজ পড়িতেন ও য়ুরোপীয় রাজনীতির সমস্ত খবর রাখিতেন।"

স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় বলেছেন--"আমি বিশ্বাস করি কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান—একটা বিষয়ে সকলেই একমত

হইবেন যে ধার্ম্মিক হইতে হইলে 'যোগী' বা 'সতী' হইবার কোনও প্রয়োজন নাই, এবং বনে যাইবারও দরকার করে না, পরন্তু গৃহ ও সমাজই ধর্ম্মের প্রশস্ত ও সর্বোত্তম ক্ষেত্র, জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা শিক্ষিত হিন্দুর চক্ষু প্রকৃষ্ট রূপে উন্মীলিত করিবার কৃতিত্ব গৌরব রামমোহন রায়েরই প্রাপ্য।"

রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত রামমোহন গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় আছেঃ--"মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বেদান্তসূত্র —গ্রন্থের ঐরূপ গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতীতি করিয়া প্রথমে ঐ গ্রন্থখানি বাংলা অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাসমতে সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্রের কর্ম্ম ও মীমাংসা থাকাতে এবং সবলোকমান্য শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যে সেই সকল মর্ম সুস্পষ্ট রূপে বিবৃত থাকাতে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মবিচার পক্ষে উহা ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল।"

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেনঃ "রামমোহন রায় বাংলা ভাষায় শুধু প্রথম গদ্য লেখক নন; গদ্য রচনার প্রকরণ পদ্ধতি বিধি নিষেধও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা ও তার বাক্য গঠন প্রণালীও যে বিভিন্ন, এ বিষয়ে তিনি সর্বপ্রথমে বাঙ্গালার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কি পদ্ধতি অনুসারে বাংলায় বাক্য গঠন করতে হয়, তার নিয়মাবলীর প্রতিষ্ঠা রামমোহনই প্রথম করেছেন।"

সমাজ সংস্কারক রামমোহনের কথা বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেনঃ—"সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দু সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় নিঃস্বার্থ কর্ম্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন ভারতের সাহায্য কল্পে অর্পণ করিয়া ছিলেন। তিনিই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ নামে বিখ্যাত ধর্ম্মসমাজ স্থাপন করেন। আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিন লক্ষ টাকা চাঁদা দেন। তিনি নিজের জন্য কোনোরূপ ফলাকাঙ্খা করিতেন না।"

ডাফ্ সাহেব যখন স্কুল খোলার জন্যে রামমোহনের স্মরনাপন্ন হয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন- "যখন শহরের

ভদ্র লোকেরা এমনি বিরোধী হইলেন যে, স্কুলের জন্য দেশীয় বিভাগে একটি বাড়ী ভাড়া করা ও পড়িবার জন্য বালক সংগ্রহ করা ডাফের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল, তখন রামমোহন রায়কে এই বিঘ্ন বাধার কথা জানাইলে তিনি ডাফের স্কুল বসাইবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের পূর্বাশ্রিত ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ী ডাফের স্কুলের জন্য স্থির করিয়া দিলেন। ইহা করিয়াও নিরস্ত হইলেন না ; স্কুল খুলিবার দিন ( ১৩ই জুলাই, ১৮৩০ ) নিজে উপস্থিত হইয়া বালকদিগকে উৎসাহিত করিলেন এবং তৎপরে সর্বদা গিয়া স্কুলের কার্য পরিদর্শন দ্বাবা ও পরামর্শদানাদি দ্বারা ডাফকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।"

এ্যাডাম্ বলেছেন—'রামমোহন হয় স্বাধীন থাকিবেন, নহিলে তাঁহার অস্তিত্বই থাকিবে না। স্বাধীনতাই ছিল তাঁহার অন্তরের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আবেগ বা প্রবৃত্তি।"

ভারত প্রবাসী ইংরাজ সংবাদিক বাকিংহাম লিখেছেন—"রামমোহন যদি ( গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা না করিয়া ) কেবল নিরপেক্ষ থাকিতেন, তাহা হইলে পদ ও চাকরীর আকারে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রচুর পুরষ্কার পাইবার সুযোগ তাঁহার হইত। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির জন্য যেমন, সত্যের জন্যও তেমনি সমান লক্ষ্য ছিল বলিয়া, তিনি স্বদেশবাসীদের উন্নতি সাধন, কুসংস্কার বিনাশ, এবং জন্মভূমির ধর্ম্ম ও শাসনপ্রণালীতে সমভাবে আবশ্যক সংস্কার যথাসম্ভব সত্বর সাধনরূপ শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে এই পুরষ্কার পাইয়াছেন যে সরকারী বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিদের এবং খ্রীষ্টিয় ইংলণ্ডীয় গীর্জার বড় বড় পাদ্রীদের অমৈত্রী ও ঈর্ষ্যার পাত্র হইয়াছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত বিষয় সম্পত্তি হইতে তিনি একেশ্বরবাদী মন্দির ও ছাপাখানা চালান। নিজের কেতাবপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। এবং নানাবিধ মানবহিতকর ও দয়াধর্ম্মের কাজ করেন। তাহাতে তাঁহার আয়ের এক তৃতীয়াংশেরও উপর ব্যয়িত হয়।'

॥ তের ॥

এরপর রামমোহনের নিজস্ব রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্বৃত্ত করলাম।

"আমার পূর্বপুরুষেরা উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের কৌলিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবধি তাহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন। রাজ-সভাসদ্দিগেয় ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ হইযা থাকে, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থায় বৈপরীত্য হইয়া আসিয়াছে; কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতিলাভ, কখন বা পতন; কখন ধনী, কখন নির্ধন; কখন সফলতালাভে উৎফুল্ল কখন বা হতাশ্বাসে কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ বংশীয়েরা কৌলিক ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মযাজক ব্যবসায়ী এবং উক্ত ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তাঁহাদিগের পরিবারের ন্যায় উচ্চতর পদবীস্থ আর কেউই ছিলেন না। তাঁহারা বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত সমভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মচিন্তাতে অনুরক্ত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগ্রহ অপেক্ষা তাঁহারা মানসিক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন।"

'আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আমি পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। মুসলমান রাজসরকারের কার্য করিতে হইলে উক্ত দুই ভাষায় জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার মাতামহ বংশের প্রথানুসারে আমি সংস্কৃত ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়নে নিযুক্ত হই; হিন্দু সাহিত্য, ব্যবস্থা ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকলই উক্ত ভাষায় লিখিত।'

'ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং ঐ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মতান্তর উপস্থিত হইল। মতান্তর উপস্থিত হইলে আমি গৃহ পরিত্যাগ-পূর্বক দেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি।

'আমি কখন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।'

"আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবেক ও সরলতার নির্দেশে যে পথ অবলম্বন করি, তাহাতে আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়গণের তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হইয়াছি। সে নিন্দা বা তিরস্কার ক্রমে সঞ্চিত হইয়া যত বড়ই হউক না কেন, আমি এই বিশ্বাসে ধীরভাবে সমস্ত সহ্য করিতে পারি যে, একদিন আসিবে, যখন আমার এই সামান্য চেষ্টা লোক ন্যায়দৃষ্টিতে দেখিবে, হয়ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবে। লোকে যাহা বলুক না কেন, এই শান্তনা হইতে আমাকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারিবেন না যে আমার আন্তরিক অভিপ্রায়গুলি সেই পরমপুরুষের নিকট গ্রাহ্য যিনি গোপনে দেখিয়া প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করেন।'

'এই সময় য়ুরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা হইল।..... ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দের বিচার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজ্যশাসন ও ভারতবাসীগণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহু বৎসরের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, ও সতীদাহ-নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভিকৌন্সিলে আপীল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম।'

রাজার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে হেমলতা দেবীর বিবরণ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হ'ল।

"রাজা রামমোহন রায়ের বড় ছেলে রাধাপ্রসাদের দুই কন্যা। তাঁর পুত্র সন্তান ছিল না। বড় মেয়ে চন্দ্রজ্যোতি, ছোট মেয়ে মৈত্রেয়ী। নাম দু'টি রাজারই রাখা। রাজার বড় পৌত্রী চন্দ্রজ্যোতির দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। রাজা স্বয়ং উপস্থিত থেকে বিবাহ দেন মুর্শিদাবাদ নিবাসী ব্রাহ্মণ সন্তান শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্প্রদান করান রাজা পুত্রবধূ যজ্ঞেশ্বরী দেবীকে দিয়ে, চন্দ্রজ্যোতির বাবা রাধাপ্রসাদকে দিয়ে না করিয়ে। বিবাহ হ'ল যথারীতি প্রচলিত অনুষ্ঠানে। সম্প্রদানের সময় রাজা নিজে দাঁড়িয়েছিলেন বাইরে। সমাজচ্যুতির ভয়ে রাজার পৌত্রিকে সে সময় অনেকেই বিবাহ করতে নারাজ হন, যদিও চন্দ্রজ্যোতি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। কি বলিষ্ঠ দেহখানি ছিল তাঁর। ভোরে উঠে দু'হাতে দুটো ভীমের গদার মত মুগুর নিয়ে ভাঁজতেন তিনি খেলার মত হেলায়। বিশ বাইশটা জলভরা সারি সারি সাজান কলসী থেকে স্নানের সময় রাজা মাথায় জল ঢালতেন চৌকিতে বসে স্বয়ং একটির পর একটি, একবার ডান হাতে একবার বাঁ হাতে নিয়ে। দুপুরে খেতে আসতেন অন্দর মহলে প্রতিদিন।... বাহির মহলে সারা দুপুর কাজ করে বৈকালে পায়ে হেঁটে তিনি বেড়াতে বেরুতেন। যাওয়ার আগে অন্দরে এসে খানিকক্ষণ ব'সে যেতেন নিয়মিত; তারও ব্যতিক্রম ঘটত না কখনো। চেয়ার পড়তো তিন-খানি—দুইখানি দুই স্ত্রীর, একখানি নিজের। স্ত্রীদের আগে না বসিয়ে রাজা নিজে বসতেন না কখনো।...চন্দ্রজ্যোতির বিবাহের পরেই রাজা বিলাত যাত্রা করেন। ছোট পৌত্রী মৈত্রেয়ী দেবী তখন নিতান্ত শিশু। যাবার আগে শিখিয়ে গেলেন নিজের ঘরের মেয়েদের ব্রহ্মমন্ত্রে উপাসনা, গায়ত্রী জপ। ভেঙ্গে দিয়ে গেলেন কুলগুরু প্রথা। তাঁর ছোট পুত্র বধূ রমাপ্রসাদের পত্নী দ্রবময়ী দেবীকে ভোর রাত্রি থেকে মহানির্বান—তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য শ্লোকগুলি আওড়াতে আমরা শুনেছি। যে

গায়ত্রী মেয়েদের কানে শোনাও ছিল নিষিদ্ধ, রাজা এনে দিলেন তাকে ঘরের মেয়েদের আয়ত্ত্বের মধ্যে ; ধর্ম্ম সংস্কারে মেয়েদের বড় অধিকার পাওয়ার পথ খুললো প্রথম। রাজার ছোট স্ত্রী উমাদেবী ছিলেন নিঃসন্তান। রমাপ্রসাদের জন্ম সময় থেকেই বিমাতা উমাদেবী তাঁকে পালনের ভার নেন, একান্ত অনুরোধের ফলে ও স্বেচ্ছায়। উমাদেবী জীবিত ছিলেন রাজার বিলাত যাত্রাকালে। যাওয়ার খবর কিন্তু রাজা তাঁকে জানিয়ে যান নাই। রাজা জাহাজে রওনা হ'য়ে যাবার পরে সে খবর তিনি পান। রাজা আর ফিরতে পারলেন না ; ওঁর সঙ্গে আর দেখা হ'ল না, এই শোকটা উমাদেবী জীবনে কখনো ভোলেন নাই।"

# ॥ জীবনের ঘটনা পঞ্জী ॥

| | |
|---|---|
| ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ | জন্ম। |
| ১৭৭৯ " | বিদ্যারম্ভ ও ফরাসী শিক্ষা। |
| ১৭৮২ " | বাংলা ও ফরাসী শিক্ষা সমাপ্ত। আরবী শিক্ষার জন্য পাটনা যাত্রা; নিরাকার বাদের উন্মেষ। |
| ১৭৮৬ " | সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কাশী গমন। |
| ১৭৯০ " | নিরাকার উপাসনার স্বপক্ষে যুক্তিপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ রচনা, মুদ্রণ ও প্রচার; তিব্বত গমন ও সেখানে জীবন সংশয়। |
| ১৭৯৪ " | স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ও ইংরাজী শিক্ষারম্ভ। |
| ১৮০২ " | পিতার মৃত্যু। |
| ১৮১২ " | সরকারী চাকরী ত্যাগ ও ধর্ম্ম সংস্কারে মনোনিবেশ। |
| ১৮১৪ " | কলিকাতায় আগমন, স্থায়ীভাবে মানিকতলায় বাস; আত্মীয় সভা স্থাপন ও ধর্ম্ম সংস্কারের বিবিধ প্রচেষ্টা; রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার। |
| ১৮২৯ " | সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ। |
| ১৮৩০ " | বিলাত যাত্রা। |
| ১৮৩১ " | ইংলণ্ডে উপস্থিতি ও রাজকীয় সম্মান লাভ। |
| ১৮৩২ " | ফ্রান্সে গমন। |
| ১৮৩৩ " | ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন ও খৃষ্টধর্ম্ম সংস্কার; ব্রিষ্টল গমন ও মৃত্যু। |

## ॥ বংশ পঞ্জী ॥

পরশুরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ( রায় )

- কৃষ্ণচন্দ্র
  - হরিপ্রসাদ
  - অমরচন্দ্র
  - ব্রজবিনোদ
    - ( ৫ম পুত্র ) রামকান্ত
      - ( কনিষ্ঠ পুত্র ) রাজা রামমোহন রায়
        - ( জ্যেষ্ঠ পুত্র ) রাধাপ্রসাদ
          - ( দুই কন্যা )
            - চন্দ্রজ্যোতি ( বড় )
            - মৈত্রেয়ী ( ছোট )
        - ( কনিষ্ঠ পুত্র ) রমাপ্রসাদ

॥ শেষ